বারো বছর বয়স হলো, তবু শম্ভুর মন থেকে ভয় যায় না। বনের ধারে শম্ভুর দাদুর ঘর, তার চারদিকটি ভয় দিয়ে ঘেরা। দিনের বেলাতে বনের ভিতর ছায়া ছায়া সড়াৎ সড়াৎ, নিঝুম চুপচাপ। সারারাত বনের মধ্যে কীসের চলাচলের শব্দ খসখস, ফসফস, মটমট ফোঁসফোঁস। পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয় শোঁশোঁ। চোখে কিছু দেখা যায় না, সব অন্ধকারের আলকাতরা মেখে অদৃশ্য হয়ে থাকে; তারই মধ্যে মাঝে মাঝে এক এক জোড়া চোখ জ্বলে ওঠে দপ করে, লাল, সবুজ, নীল, তার রং। আর শম্ভু ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। গাছের ডালে কীসের যেন ডানা ঝাপটায় ঝাপুড়ঝুপুড়! শম্ভু দু-কানে আঙুল দিয়ে মাথার ওপরে চাদর টেনে চুপ করে শুয়ে থাকে। দাদুর কথায় ভয় ভাঙে না! পিসির আদরে মন মানে না। দিনের বেলায় গুরুমশায়ের পাঠশালার সবচেয়ে যে দুরন্ত ছেলে, রাতে সে হয়ে যায় ভয়ে কাদা। একদিন ঝোড়ো-সন্ধ্যাবেলায় পিসি ভেবে ভেবে সারা।

পিসি : ও শম্ভু, অন্ধকার হয়ে গেল এই ঝড় উঠল বলে, কিন্তু তোর দাদু তো এখনও ফিরল না। যা বাবা লণ্ঠনটা নিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দ্যাখ।

শম্ভু : ও বাবা। সুয্যি ডুবে গেছে কতক্ষণ! সে আমি পারব না। দাদু এক্ষুনি এসে পড়বে দেখো।

পিসি : কী জানি বাবা, এত রাত তো সে কখনও করে না। একবারটি যা, বাপ।

শম্ভু : আমার—আমার বড়ো ভয় করে।

পিসি : কীসের ভয়, শম্ভু?

শম্ভু : বনের ভয়, অন্ধকারের ভয়।

পিসি : ও কী কথা, শম্ভু? যে বন আমাদের খাওয়ায় পরায়, যেখান থেকে আমার বুড়ো বাবা গাছগাছলা, ওষুধ, আঠা, মধু খুঁজে আনে, সে যে আমাদের মা-বাপ, তাকে ভয় করলে চলবে কেন?

শম্ভু : তোমার ভয় করে না, পিসি, তুমিও যাও না কেন লণ্ঠন নিয়ে; আমি পারব না। অন্ধকারে আমার ভয় করে।

পিসি : (রেগে) আমার পায়ে বাত না থাকলে আমিই যেতাম। দেখি, একটু দোরটা খুলে দেখি।

[ক্যাঁচ করে দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের শব্দ ঘরে আসে। দুমদাম করে বাসনকোসন গড়িয়ে পড়ে।]

শম্ভু : (চিৎকার করে) ও কী করছ, পিসি, ঘরের চাল যে উড়িয়ে নেবে। বন্ধ করো, বন্ধ করো শিগগির। (দুম করে দরজা বন্ধ করল)

পিসি : (কাঁদো কাঁদো সুরে) এই জল ঝড়ে বুড়ো দাদু রইল বাইরে, আর তুই উনুনের পাশে আরামে বসে থাকতে পারছিস শম্ভু?

(দরজায় ধাক্কা দেওয়ার শব্দ)

শম্ভু : খুলো না, খুলো না বলছি—পিসি, ও দাদুর ধাক্কা নয়, দাদু আস্তে আস্তে টোকা দেয়।

পিসি : না, আমি নিশ্চয় জানি তার কোনো বিপদ হয়েছে।

[দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের গর্জন ও দু-তিনজন লোকের পায়ের শব্দ।]

নিতাই : আমাকে চিনতে পারছেন না, পিসিমা? আমি পাঠশালার নিতাই। দাদুকে গাছতলায় পড়ে থাকতে দেখে, আমিই গিয়ে গুরুমশাইকে ডেকে আনলাম।

পিসি : ও কী! কে তোমরা? বাবাকে অমন ধরাধরি করে আনছ কেন? বাবার চোখ বন্ধ কেন? ও গুরুমশায়, ভয়ে যে আমার প্রাণ উড়ে যাচ্ছে।

নিতাই : ওঠ শম্ভু, দেখছিস না আমি কেমন জলঝড়ে বেরিয়ে পড়েছি? তোর অত ভয় কীসের?

গুরু : ভয় পাবেন না মা। দাদু গাছ থেকে পড়ে অচেতন হয়েছেন, বোধহয় পায়ের হাড় ভেঙেছে। কোনো ভয় নেই, মা, আমি ওষুধ বলে দিচ্ছি। শম্ভু টোকা মাথায় দিয়ে এক দৌড়ে এনে দিক! দাদু ভালো হয়ে যাবেন। শম্ভু পিসির পিছনে লুকুচ্ছিস যে বড়ো? এদিকে আয়, ওষুধ আনতে হবে।

পিসি : ও ছেলেমানুষ—

গুরু : কীসের ছেলেমানুষ? বারো বছরের বুড়ো ছেলে! আমাদের যা করবার আমরা করেছি। এখন শম্ভু যাক, আপনাদের বাড়ির পিছনেই সুসনি পাহাড়। সুসনি পাহাড়ের মাথায়

হাড়ভাঙা পাতার গাছ, আর পাথরের গুহাতে লাল মধু উপচে পড়ে পাথরের গা বেয়ে গড়াচ্ছে। ওই পাতা বেটে, মধুর সঙ্গে মিশিয়ে লাগিয়ে দিলেই ব্যথা সেরে যাবে। তবে সাবধান দেরি করলে পা ফুলে ঢোল হয়ে যাবে। তখন ওষুধের গুণ ধরবে না। দু-ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ লাগাতে হবে। আচ্ছা আমরা চললাম। শম্ভু বেরিয়ে পড়। জলঝড় কমে এসেছে। এই বেলা পথ ধর।

[দরজা খুলে প্রস্থানের শব্দ। দরজা বন্ধ।]

পিসি : ও কী রে শম্ভু মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লি যে বড়ো? শুনলি না দু-ঘণ্টার মধ্যে ওষুধ না লাগালে ওষুধের গুণ ধরবে না?

শম্ভু : না ধরে না ধরুক। কাল ভোরে উঠে এনে দেব, এখন আমি বেরোতে পারব না।

বুড়ো দাদু অসাড় অচেতন হয়ে পড়ে থাকে, পিসিও তার পাশে মুখ গুঁজে বসে থাকে, কেউ কথা কয় না। উনুনের উপরে ভাতের হাঁড়ি টগবগ করে ফুটতে থাকে কিন্তু দাদুর মুখে কথা নেই, ছাই-এর মতো সাদামুখ। উশখুশ করতে থাকে শম্ভু, আহা দাদু যদি না বাঁচে! তবু ঘরখানি যেন দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে রাখতে চায়। উনুনের পাশের গরম জায়গাটি থেকে মেনি বেড়াল মিটমিট করে চায়।

বেড়ালের গান

মিয়াও! কোথা যাও?
যেও না কো!
এই ঘরেতে আরাম বড়ো,
সুখে থাকো!
কে বলে গো বাইরে যেতে?
আরামেতে গরমেতে
নিরাপদে বিছানা পেতে,
শুয়ে থাকো!
যেও নাকো!
ঝড়ে পড়ে জলে ভিজে
কেন মিছে মরবে নিজে
যেও না কো!

পিসি : শম্ভুরে, যখন এততটুকুটি ছিলি, বাপ-মা তোর বিদেশে গেল, দাদুই তোকে বুকে করে মানুষ করল, সেসব কথা কি ভুলে গেছিস? যে আমাদের প্রাণ দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিল, মাথার উপরকার এই ঘরের ছাদ নিজের হাতে বেঁধেছিল, হাঁড়ির ভিতরকার ওই চাল নিজে গিয়ে হাট থেকে কিনে এনেছিল, কত কষ্টের টাকা দিয়ে, তাকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না।

আর বসে থাকতে পারে না শম্ভু, দেয়াল থেকে টোকা পাড়ে, তাক থেকে লণ্ঠন জ্বালে, মধুর শিশি নেয়। পিছন ফিরে চায় না, পিসিকে কিছু না বলে দরজা ঠেলে জল ঝড়ে বেরিয়ে পড়ে।

[দরজা দুম করে বন্ধ হওয়ার শব্দ,—সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ঝড়ের অট্টরোল। কে যেন গর্জন করে ডাকে—শম্ভু—শম্ভু—শম্ভুউ—উ—]

শম্ভু : (ভয়ে মুখ ঢেকে) — কে—কে—তোমরা? অন্ধকারে ডানা মেলে আমাকে ধরতে আসছ? আমি—আমি কোথায় পালাব? ও কে? ও কে?

প্যাঁচাদের গান

হুতুমরা : হুতুম থুম হুতুম থুম
কে যায় রেতে?
চোখে নেই ঘুম?
বাঁকা ঠোঁট, ভাঁটা চোখ,
জোরালো পাখা, ধারালো নোখ।

লক্ষ্মীপ্যাঁচারা : আমরা প্যাঁচা, প্যাঁচা, প্যাঁচা,
এবার প্রাণের ভয়ে চ্যাঁচা!
পাসনি ভয়—
তাই কি হয়?

হুতুমরা : হুতুম থুম হুতুম থুম।

শম্ভু : না, না, কোথায় তোমরা? কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? কোথায় তোমরা? (লণ্ঠনটা তুলে) দেখি তোমাদের মুখ।

শম্ভু যেই না তুলে ধরেছে লণ্ঠন, অমনি প্যাঁচাদের চোখে আলো পড়েছে, আর চোখ গেছে ধাঁধিয়ে। প্যাঁচারা তখন ডানা দিয়ে মুখ ঝেঁপে পালাবার পথ পায় না।

শম্ভু : আঃ, বাঁচা গেল, সব পালিয়েছে। কিন্তু—কিন্তু গাছগুলো অমন কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়েছে কেন, দিনের বেলায় তো ওরকম থাকে না। আর আর ওই যে তালগোল পাকিয়ে ডালের উপরে, ওটা কী? ও বাবা!—কেন যে এলাম মরতে এই রাতে।

গাছেদের গান

যা ফিরে যা! হাত ধরাধরি
পথ বন্ধ করি।
ঝুরি নামিয়ে।
দিই থামিয়ে।
দেখ প্রকাণ্ড, আমাদের কাণ্ড
পথ জুড়ে রয়,
নেই তোর ভয়?

শম্ভু : না, না, না, অমন করে আমাকে ঘিরে ফেলো না। কী করি এখন? কোন দিকে পালাই? দেখি, দেখি, পালাবার পথ কই।

চারিদিকে আলো ফেলে। শম্ভু দেখে গাছের ডালে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ও তো মোটেই অজগর নয়, ঝুরিগুলো ওই রকম তালগোল হয়ে আছে। আর গাছের তলা দিয়ে ওই যে এঁকেবেঁকে চলেগেছে সুসনি পাহাড়ে যাওয়ার পথটি।

শম্ভু : উফ! বাঁচা গেল। গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে। বাবা! বনজঙ্গলে আমার বড়ো ভয় করে। কিন্তু ওগুলো কী, ছায়ার মতো এ-ঝোপের পিছন থেকে ও-ঝোপের পিছনে চলে যাচ্ছে। ও বাবা! কী ওগুলো? বাঘ নাকি?

বনবেড়ালদের গান

১ম : বন ভোজন হবে, আহা,
সকলে : বাহবা বাহবা বাহা! বন ভোজন হবে!
২য় : কবে?

১ম : শিকার ধরলে তবে।
২য় : শিকার ধরগে তবে।
সকলে : আহা!
বাহবা বাহবা বাহা!

তখন উঠে পড়ে শম্ভু, ভয়ে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়, চোখ বুজে ইদিক উদিক ছোটে। হাত থেকে টোকা পড়ে যায়, লন্ঠন পড়ে যায়, মধুর শিশি মাটিতে গড়াগড়ি খায়। মনসাগাছে ঝোপে-ঝোপে ঠোকর খায়। ঝোপরা তাকে টিটকিরি দেয়।

মনসাঝোপের গান

কাঁটা ভরা গায়ে
ব্যথা দেব পায়ে!
দ্যাখ না ঝোপের মাঝে
বাঁকারা লুকিয়ে আছে,
তাদের নাম করতে নেই,
যারা রক্ত শোষে সেই!
ঝোপে ঝাড়ে গাছে
তাদের চক্ষু জেগে আছে।
এ পথে কেউ যায়?

হোঁচট খেয়ে আবার পড়ে যায় শম্ভু, হাতের তলায় মধুর শিশি খুঁজে পায়। ভয়ের শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার টোকা তুলে নেয়, লন্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে। অমনি চারদিকে সরসর, পালাপালা, বনবেড়ালের দল চোখ ছোটো করে, মনসাঝোপের আড়াল দিয়ে আস্তানায় ফিরে যায়।

শম্ভু : আরে এই তো পৌঁছে গেছি, এই যে গোছা গোছা হাড়ভাঙা পাতার গাছ। আর ওই তো মধুর গুহা। এবার শিশিটা ভরে নিলেই হলো। কিন্তু — কিন্তু গুহার ভিতরটা অমন অন্ধকার কেন? কীসের সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে? এতদূর এসেও শেষটা কী খালি হাতেই ফিরতে হবে? ইস! কী অন্ধকার!

বাদুড়দের গান

ডানা মেলা কালো ভয়,
তারই হোক জয়!
আঁধারে জ্বলিছে দাঁতের সারি,
করাল কঠিন ধারালো ভারি,
তারই হোক জয়।
আলো না সয়,
গুহাতে রয়,
তারই হোক জয়।
সোঁদা গন্ধ, বন্ধ গুহা
সেখানে ভয়!
তারই হোক জয়!

শম্ভু : (স্বর বদলে)—না! আলো যে সইতে পারে না তাকে আমি ভয় করব না। এই আলো তুলে ধরলাম। কে আছ ভিতরে, বেরিয়ে এসো। আমি মধু নেব, আমি তোমাদের ভয় পাই না! আমার দাদুকে আমি ভালো করে তুলব, কেউ আমাকে বাধা দিতে পারবে না।

অমনি সরসর ফড়ফড় ঝটফট করে, আলোয় অন্ধ রাশি রাশি বাদুড় ডানা মেলে গুহা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। লণ্ঠনের আলোতে শম্ভু দেখলে ফাঁকা গুহা, তার দেয়ালের গায়ে টুপ টুপ করছে মৌচাক, পাথর বেয়ে মধু গড়াচ্ছে। শিশি ভরে বাইরে বেরিয়ে দু-মুঠো হাড়ভাঙা পাতা তুলেই এসে দেখে শম্ভু, কখন মেঘ কেটে গেছে, দূরে দূরে খানকতক মনসাঝোপ! আর পায়ের কাছেই গাছের তলা দিয়ে ঘরে ফেরার পথ। মুখ তুলে বুক ফুলিয়ে দৌড়ে শম্ভু সেই পথ ধরল। চারদিক যেন গান গেয়ে উঠল, ভয়-দূর-করা আলোর গান, সাহসের গান।

যবনিকা পতন

হাতে কলমে

লীলা মজুমদার (১৯০৮—২০০৭) : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধরীর ভ্রাতা এবং প্রখ্যাত লেখক প্রমদারঞ্জন রায়ের কন্যা। লেখিকা ছোটোদের জন্য প্রথম যে বইটি লেখেন তার নাম *বদ্যিনাথের বড়ি*। তাঁর লেখা অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বই — *হলদে পাখির পালক*, *চিনে লণ্ঠন*, *পাকদণ্ডী*, *পদিপিসির বর্মিবাক্স*, *মাকু* ইত্যাদি। লেখিকার অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক — *বকবধ পালা*, *লঙ্কাদহনপালা*। যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে বহুদিন *সন্দেশ* পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেছেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি *রবীন্দ্র পুরস্কার* এবং *আনন্দ পুরস্কার* পেয়েছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যসম্ভার শুধুমাত্র বাংলায় নয়, বিশ্বের দরবারে সমাদৃত।

১. লীলা মজুমদারের সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম কী?

২. তাঁর লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ নিতাই কে?

৩.২ সারারাত বনের মধ্যে কেমন শব্দ হয়?

৩.৩ শম্ভুর দাদু বন থেকে কী কী খুঁজে আনে?

৩.৪ কারা শম্ভুকে ভয় দেখিয়েছিল?

৩.৫ শম্ভুর দাদুর জন্য কী আনতে গিয়েছিল?

৩.৬ দাদুর পায়ের ব্যথা কোন ওষুধে সারবে?

৩.৭ শম্ভু শেষপর্যন্ত মন থেকে কী দূর করতে পেরেছিল?

৩.৮ এই নাটকে মোট কয়টি চরিত্রের দেখা মেলে?

৪. **ঠিক শব্দটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :**

৪.১ শম্ভুর _______ (বারো / তেরো/ চোদ্দো) বছর বয়স।

৪.২ _______ (পাহাড়ের / বনের / মাঠের) ধারে শম্ভুর দাদুর ঘর।

৪.৩ দিনের বেলায় পাঠশালার সবচেয়ে দুরন্ত ছেলে _______ (নিতাই / গুরু / শম্ভু)।

৪.৪ হাড়ভাঙা পাতার গাছ _______ (সুসনি/ শুশুনিয়া) পাহাড়ের মাথায়।

৪.৫ শম্ভুকে বাইরে যেতে বারণ করেছিল _______ (কাক / গোরু/ বেড়াল)।

৫. 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও :

ক	খ
পাঠশালা	কাঁটা
বন	ভাত
হাঁড়ি	ভয়
অন্ধকার	গুরুমশায়
মনসাঝোপ	গাছপালা

৬. পাশের শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ নিয়ে বাক্যটি সম্পূর্ণ করো :

৬.১ পাতার ফাঁক দিয়ে বাতাস বয় ______।

৬.২ বুড়ো দাদু ______ অচেতন হয়ে পড়ে থাকে।

৬.৩ হাতের তলায় ______ শিশি খুঁজে পায়।

৬.৪ দূরে দূরে খানকতক ______।

৬.৫ করাল কঠিন ______ ভারি।

শব্দঝুড়ি
ধারালো, অসাড়, মধুর, শোঁ শোঁ, মনসাঝোপ।

শব্দার্থ : প'ল — পড়ল। ধ'ল — ধরল। অচেতন — অজ্ঞান। উশখুশ — অস্থিরতার ভাব। হাট — গ্রামের বাজার, যা প্রতিদিনের পরিবর্তে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসে। টোকা --- তালপাতা দিয়ে তৈরি বড়ো টুপি। লণ্ঠন — কাচ দিয়ে ঘেরা বাতিবিশেষ। হোঁচট — ঠোক্কর, ধাক্কা। আস্তানা — বাসস্থান। সোঁদা গন্ধ — ভিজে মাটির গন্ধ।

৭. একই অর্থের শব্দ পাঠ থেকে খুঁজে নিয়ে লেখো : বায়ু, শিক্ষক, বিদ্যালয়, অজানা, শিলা, আঁখি।

৮. বিপরীতার্থক শব্দ লিখে তা দিয়ে বাক্যরচনা করো : গরম, দুঃখ, দুরন্ত, ভয়, বন্ধ।

৯. নীচের বর্ণগুলি কোনটি কী তা পাশে '✓' চিহ্ন দিয়ে বোঝাও :

বর্ণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অঘোষ	সঘোষ
ক				
ছ				
থ				
দ				
ব				
ঘ				
ট				
ন				

১০. **পাঠ থেকে ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলি খুঁজে নিয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করো :** (যেমন—খসখস)

১১. **বাক্য বাড়াও :**

১১.১ আমি নেব। (কী নেব?)

১১.২ দাদু অচেতন হয়েছেন । (কীভাবে?)

১১.৩ চাল নিজে গিয়ে কিনে এনেছিল। (কোথা থেকে?)

১১.৪ নাকে গন্ধ আসছে। (কেমন গন্ধ?)

১১.৫ বনবেড়ালের দল মনসাঝোপের আড়াল দিয়ে ফিরে যায়। (কোথায়?)

১২. **নীচের বাক্যগুলির মধ্যে থেকে কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদগুলি খুঁজে বার করো :**

১২.১ আমি ওষুধ বলে দিচ্ছি।

১২.২ বাঁকারা লুকিয়ে আছে।

১২.৩ সূয্যি ডুবে গেছে কতক্ষণ!

১২.৪ ঝোপরা তাকে টিটকিরি দেয়।

১২.৫ দাদুকে আমি ভালো করে তুলব।

কর্তা	কর্ম	ক্রিয়া

১৩. **নীচের দুটি ছবির মধ্যে ছয়টি অমিল খুঁজে বের করো :**

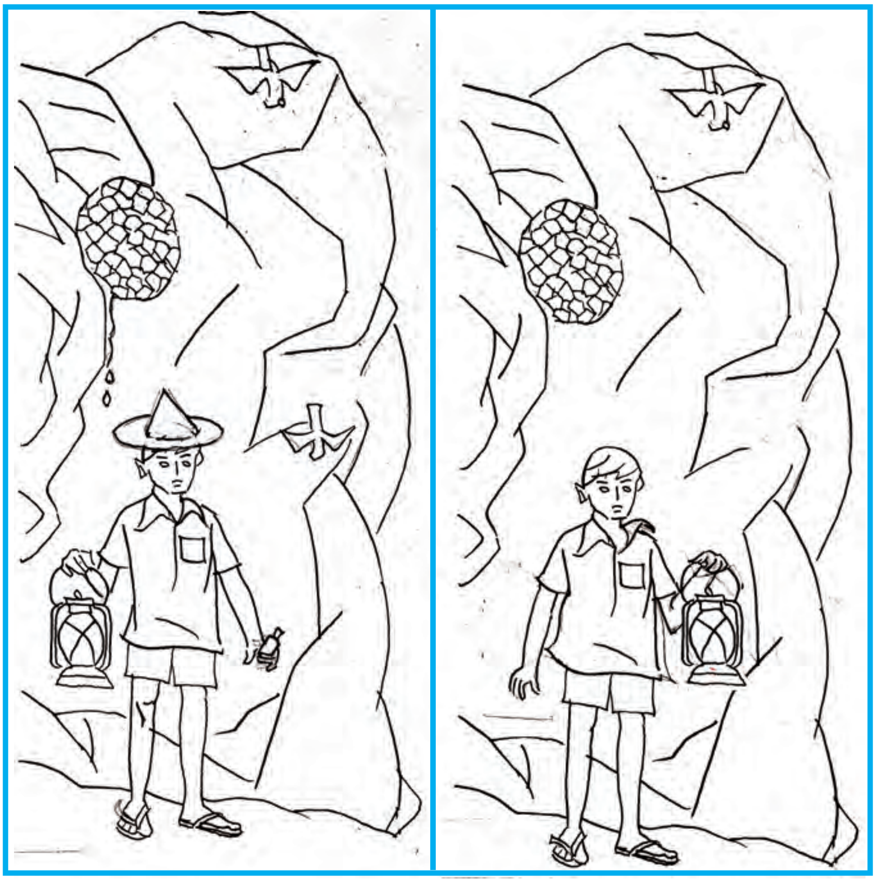

বর্ষার প্রার্থনা

জসীমউদ্দীন

জসীমউদ্দীন (১৯০৪-১৯৭৬) : বিখ্যাত কবি, গীতিকার, লোকসংস্কৃতি গবেষক। ‘পল্লীকবি’ নামেই তিনি সমধিক খ্যাত। তাঁর লেখা গীতিগ্রন্থগুলির মধ্যে ‘রঙ্গিলানায়ের মাঝি’ ‘গাঙের পার’, ‘মুর্শিদা গান’, ‘পদ্মাপার’, ‘রাখালি গান’ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেলা দ্বিপ্রহর ধু ধু বালুচর
ধূপেতে কলিজা ফাটে পিয়াসে কাতর
আল্লা মেঘ দে পানি দে ছায়া দেরে তুই॥

আসমান হইল টুডা টুডা জমিন হৈল ফাডা
মেঘরাজা ঘুমাইয়া রইছে মেঘ দিব তোর কেডা॥
আলের গোরু বাইন্দ্যা গিরস্থ মরে কাইন্দা
ঘরের রমণী কান্দে ডাইল খিচুড়ি রাইন্দা॥
আমপাতা নড়ে চড়ে কাডল পাতা ঝরে
পানি পানি কইরা বিলে পানি-কাউরী মরে॥
ফাইট্যা ফাইট্যা রইছে যত খালা-বিলা-নদী
জলের লাইগা কাইন্দা মরে পংখী জলধি॥
কপোত-কপোতী কান্দে খোপেতে বসিয়া
শুকনা ফুলের কড়ি পড়ে ঝরিয়া ঝরিয়া॥

অ্যাডভেঞ্চার : বর্ষায়

মণীন্দ্র গুপ্ত

গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছি। খবর পেয়ে ছোটোপিসিমা আর সেজোপিসিমার চার ছেলেমেয়ে তাদের দুই দূর গ্রামের বাড়ি থেকে একসঙ্গে এসে হাজির। আমরা সবাই দু-এক বছরের ছোটো বড়ো। সেজোপিসিমার মেয়ে একটি পাক্কা টমবয়—সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়, মারামারি বাঁধলে দঙ্গলে লড়ে। তার নাকে নোলক, কিন্তু মাথাটি ন্যাড়া।

এক বাড়ির মজা যথেষ্ট না, সুতরাং ঠিক হলো আমাদের দলটা এবার ছোটোপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে।

সকালবেলা ফেনসা ভাত খেয়ে আমরা চার ভাই এক বোন বেরোলাম। আমাদের মধ্যেকার আনন্দ দিগন্ত পর্যন্ত বাতাসের সঙ্গে হু হু করে ছুটে চলেছে, শূন্যে রামধনুর মতো আমাদের ফুর্তি ঠিকরোচ্ছে। আমাদের প্রত্যেকের শরীর লঘু, পাখির মতো শিস দিতে পারি, চাইলে উড়তেও বোধহয় পারি।

আমরা যতরকম সম্ভব মজা করতে করতে পথ চলতে লাগলাম। মাটির উঁচু পথের দু-পাশে নানা উচ্চতার পাটক্ষেত। গ্রীষ্মের রোদ কড়া হতে পারছে না—পাটক্ষেতের নীল হাওয়া এসে তাপ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পড়ন্তবেলায় আমরা অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম বাটাজোড় ছাড়ালাম, সন্ধ্যার আগেই পৌঁছোলাম ছোটোপিসিমার বাড়ি।

ছোটোপিসিমা বিধবা হয়ে তখন একা একা ভিটে আগলান, ছেলেদের আগলান। কিন্তু তাঁর প্রাণশক্তি প্রচুর—দিনে খলবল করে কাজ করেন, রাতে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পাহারা দেন। চোর, ডাকাত, প্রতিবেশী এবং সন্তানেরা কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

ছোটোপিসিমার কাছে দু-দিন নানারকম খেয়ে, তিন দিনের দিন আমাদের দলটা চলল সেজোপিসিমার বাড়ির দিকে। তাঁদের গ্রামের নাম চন্দ্রহার।

বেশ হই হই করে পথ চলছিলাম। অপরাহ্ণে হঠাৎ মেঘ উঠল যেন নীল ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা। বাতাস আর বিদ্যুৎ তার মধ্যে এসে ঘোঁট পাকাতে লাগল। তারপর পুটপাট করে বৃষ্টি নামল। আমাদের পাঁচজনের তাপ্পিমারা একটামাত্র ছাতা, সেটাও হাওয়ার দমকে উলটে গেল। বৃষ্টি ঝেঁপে এলে পথের পাশে গাছতলায় দাঁড়াই, কমে গেলে আবার হাঁটি—এইভাবে থেমে থেমে চলতে চলতে শেষে বিরক্ত হয়ে বেপরোয়া বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম। মাঠে মাঠে জল দাঁড়িয়ে গেছে। ছোটো ছোটো স্রোত এসে পড়ছে খালে, দূরে দেখা যায় পাটক্ষেতের উপর বৃষ্টি ঘুরপাক খাচ্ছে, জলের ছায়া কত দূর পর্যন্ত আমাদের ঘিরে আছে।

সন্ধ্যার মুখে পিসিমাদের বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখি মাঠের জল একটা টুবুটুবু ভরা পুকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছে, আর সেই গোড়ালিডোবা ছিপছিপে জলের পথ ধরে পুকুরের আধ হাত লম্বা পুরোনো কই মাছেরা সার বেঁধে মাঠ পেরিয়ে চলেছে দেশান্তরে। আমরা কালক্ষেপ না করে দেড়-দুই কুড়ি কই সেই উলটানো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম।

সেজোপিসিমার বাড়ি দু-দিন কাটল, তিন দিন কাটল, কিন্তু সেই নাগাড়ে বৃষ্টি আর থামে না। এই জলের মধ্যে পিসি ছাড়বে না, এদিকে আমার মন ছটফট করছে নিজের বাড়ির জন্য। এক পিসতুতো ভাই একটা তুক বলল, একশোটা পুর কাগজে লিখে পোড়ালে নাকি বৃষ্টি থেমে যায়। আমি কাশীপুর, চাঁদপুর, ফতেপুর, বদরপুর, শিবপুর, অনুরাধাপুর—পৃথিবীর যত পুর আছে লিখে পোড়ালাম। কিন্তু কিছু হলো না। আমি থেকে থেকে আকাশ দেখি: অশেষ মেঘ। মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে। শেষে দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বৃষ্টি যেই একটু ধরেছে আমি সবচেয়ে ছোটো ভাইটাকে বলে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

পথঘাট জলে ভেজা, বাতাসে জলকণা। এক্ষুনি আবার বৃষ্টি আসবে। আমি হনহন করে পা চালালাম। পথ একেবারে জনহীন, একটা গোরু-বাছুর পর্যন্ত নেই। দিগন্ত পর্যন্ত দু-দিকে শুধু পাটক্ষেত। মাইল

দুয়েক যেতে না যেতে বৃষ্টি এল, আমি না থেমে চলতে লাগলাম, এখনও অন্তত দশ ক্রোশ অচেনা পথ পাড়ি দিতে হবে।

মাঠের বৃষ্টি বড়ো বিশাল। অনাবৃত পৃথিবীকে নিরাশ্রয় পেয়ে তার বল দুর্ধর্ষ। বাতাসের বেগ জলের রেখাকে থুড়ে থুড়ে ধোঁয়া করে দিচ্ছে। পিঠের উপরে বৃষ্টি আমাকে তার পেরেকগাঁথা থ্যাবড়া হাতে চড়ের পর চড় মারছে। কিন্তু ভালোই হলো—ঝড়ের ধাক্কা আমাকে তিনগুণ বেগে ঠেলে নিয়ে যেতে লাগল সামনে— শরীরটাকে শুধু খাড়া রাখতে পারলেই হলো, পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়।

কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে বৃষ্টি নেমেছে নাকি! বাতাসের গর্জনের সঙ্গে চারিদিকে বাজ ডাকছে কড় কড় কড় কড়—আমি ছাড়া এই বাংলা দেশের মাঠে কেউ নেই।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর হাওয়ার দমকে আমার শরীরে এবার ঠান্ডার কাঁপুনি ধরল। আমি প্রায় দৌড়োতে লাগলাম। এমন সময় দেখি সামনে চাঁদসির লোহার পুল। আষাঢ়ান্ত বেলার তখনও খানিকটা বাকি আছে। বৃষ্টিও একটু ধরে এল। বৃষ্টি থেমে যাওয়া হাওয়ায় আমি ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটতে লাগলাম। বাড়িতে যখন পৌঁছোলাম তখন মেঘলোকে রক্তহীন শেষ সূর্যাস্তলেখা।

বড়োমা ছোটোমা আমাকে ওই ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি গা-মাথা মুছে, শুকনো কাপড় পরে, পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম শরীর গরম করতে।

হাতে কলমে

মণীন্দ্র গুপ্ত (১৯৩০ —) : বাংলা কবিতা ও গদ্য রচনায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম। গদ্য-পদ্য মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় তিরিশ। দীর্ঘকাল *পরমা* নামে একটি ক্ষুদ্র পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে— *অক্ষয় মালবেরি, চাঁদের ওপিঠে*। ২০১১ সালে তিনি *সাহিত্য অকাদেমি* পুরস্কারে সম্মানিত হন।

১. মণীন্দ্র গুপ্ত কোন পত্রিকা সম্পাদনা করতেন?

২. তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখো।

৩. **অনধিক দুটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :**

৩.১ এই গল্পের কথক কী সূত্রে বাড়ি এসেছিল?

৩.২ খবর পেয়ে কারা কারা এল?

৩.৩ ‘টমবয়’ শব্দের অর্থ কী?

৩.৪ কার নাকে নোলক ছিল?

৩.৫ ভাই-বোনেরা মিলে কী ঠিক করল?

৩.৬ ‘ফেনসা ভাত’ কী?

৩.৭ অশ্বিনীকুমার দত্ত কে ছিলেন?

৩.৮ কথক এবং তার ভাই-বোনেরা সন্ধ্যার আগেই কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল?

৩.৯ পাঁচ ভাই-বোনের কাছে ছাতা কটা ছিল?

৩.১০ বাড়ি ফিরে কথক কী করেছিল?

৪. **সন্ধি বিচ্ছেদ করো :** দেশান্তর, আষাঢ়ান্ত, সূর্যাস্ত, অপরাহ্ণ, ব্যাকুল।

৫. **নীচের শব্দগুলি বিভিন্ন স্বাধীন বাক্যে ব্যবহার করো :** হই হই, পুটপাট, টুবুটুবু, ছিপছিপে, ছটফট, কড়কড়।

৬. **লিঙ্গান্তর করো :** সেজোপিসিমা, ন্যাড়া, ভাই, প্রতিবেশী।

৭. **নীচের বাক্যগুলির নিম্নরেখাঙ্কিত অংশে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে চিহ্নিত করো :**

৭.১ সকালবেলা ফেনসা ভাত খেয়ে <u>আমরা চার ভাই এক বোন</u> বেরুলাম।

৭.২ <u>ছোটো ছোটো স্রোত</u> এসে পড়ছে খালে।

৭.৩ <u>সেজোপিসিমার মেয়ে</u> একটি পাক্কা টমবয়।

৭.৪ পুকুরের <u>আধ হাত লম্বা পুরোনো কই মাছেরা</u> সার বেঁধে মাঠ পেরিয়ে চলেছে দেশান্তরে।

৭.৫ আমরা কালক্ষেপ না করে <u>দেড়-দুই কুড়ি কই</u> সেই উলটানো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম।

শব্দার্থ : গাছকোমর --- কোমরে কাপড় শক্ত করে পেঁচিয়ে বা জড়িয়ে নেওয়া। দঙ্গল --- দল। ফেনসা ভাত — ফেন সমেত ভাত। ঘোঁট — গোলমাল। অনাবৃত — আবরণহীন। দুর্ধর্ষ — যাকে পরাজিত করা কষ্টকর। আয়াসে — পরিশ্রমে। আষাঢ়ান্ত — আষাঢ় মাসের শেষ। সেঁধিয়ে — প্রবেশ করে।

৮. নীচের বাক্যগুলিতে কোন পুরুষের ব্যবহার হয়েছে লেখো :

৮.১ আমরা সবাই দু-এক বছরের ছোটো বড়ো।

৮.২ সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়।

৮.৩ পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম শরীর গরম করতে।

৮.৪ বড়োমা ছোটোমা আমাকে ওই ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক।

৮.৫ চোর, ডাকাত, প্রতিবেশী এবং সন্তানেরা কেউ তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে না।

৯. নীচের রেখাঙ্কিত শব্দগুলির অর্থ এক রেখে অন্য শব্দ বসাও :

৯.১ মারামারি বাঁধলে দঙ্গলে লড়ে।

৯.২ শেষে বিরক্ত হয়ে বেপরোয়া বৃষ্টির মধ্যেই হাঁটতে লাগলাম।

৯.৩ পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়।

৯.৪ এক পিসতুতো ভাই একটা তুক বলল।

৯.৫ বৃষ্টিও একটু ধরে এল।

১০. শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো :

১০.১ পা বিনা আয়াসে অতি দ্রুত মাটি ______ চলে যায়।

১০.২ আমি ঠকঠক করে ______ হাঁটতে লাগলাম।

১০.৩ ______ জল দাঁড়িয়ে গেছে।

১০.৪ মাইলদুয়েক ______ বৃষ্টি এল।

১০.৫ সে গাছকোমর বেঁধে আমাদের ______ গাছে উঠে যায়।

শব্দঝুড়ি
আগে আগে, মাঠে মাঠে,
ছুঁয়ে ছুঁয়ে,কাঁপতে কাঁপতে,
যেতে না যেতে

অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৬৫-১৯২৩) : জন্মস্থান বরিশাল জেলার বাটাজোড় গ্রাম। পেশায় শিক্ষক, দৃঢ়চেতা অশ্বিনীকুমার ছিলেন বহু ভাষাবিদ, সুপণ্ডিত। তিনি *বরিশালের গান্ধি* নামে খ্যাত ছিলেন। *ভক্তিযোগ, কর্মযোগ* ইত্যাদি বইয়ে তাঁর জ্ঞানের স্বাক্ষর রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে অশ্বিনীকুমার দত্ত সমাজসেবা এবং দেশসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সেজোপিসিমার টমবয় মেয়ে — ‘টমবয় মেয়ে’ বলতে এককথায় বলা যেতে পারে ডানপিটে বা দুর্দান্ত প্রকৃতির মেয়ে। যে মেয়েরা সাধারণত হই হই করে বিপজ্জনক খেলা খেলতে ভালোবাসে তাদের এই নামে ডাকা হয়। আলোচ্য পাঠ্যাংশে সেজোপিসিমার দুরন্ত, সাহসী মেয়েটিকে তার লাগামছাড়া স্বভাবের জন্য ‘টমবয়’ বলা হয়েছে।

১১. 'আমি কাশীপুর, চাঁদপুর, ফতেপুর, বদরপুর, শিবপুর, অনুরাধাপুর—পৃথিবীর যত আছে লিখে পোড়ালাম।' — বিভিন্ন শব্দের শেষে '-পুর' শব্দটি যোগ করে বাংলার প্রচুর স্থান নাম তৈরি করা যায়। এখানে উল্লেখ নেই এমন আরো অন্তত পাঁচটি তোমার চেনা জায়গার নাম লেখো যাদের নামের শেষে '-পুর' আছে। এছাড়া আরও কিছু শব্দ শেষে বসে বিভিন্ন জায়গার নাম তৈরি হতে পারে। যেমন- 'নগর', 'গঞ্জ', 'হাটা', 'গাছা/গাছি', 'তলা', 'গুড়ি', 'ডোবা/ডুবি', 'ডাঙা' প্রভৃতি। এই ধরনের একটি করে নাম দেওয়া থাকল, তুমি আরও কিছু নাম যোগ করে নীচের ছকটি সম্পূর্ণ করো :

-নগর	অশোকনগর
-গঞ্জ	ডালটনগঞ্জ,
-হাট/হাটা	গড়িয়াহাট/দিনহাটা,
-গাছি/গাছিয়া	সারগাছি/বেলগাছিয়া,
-গ্রাম/গাঁ	নন্দীগ্রাম/বনগাঁ,
-তলা	বটতলা,
-গুড়ি	ময়নাগুড়ি,
-ডাঙা	বেলডাঙা,
-ডোব/ডুবি	আমডোব/ফুলডুবি,
-দহ/দা	শিয়ালদহ/খড়দা,
-পাড়া	বিশরপাড়া,
-খালি	কৈখালি,
-ঘরিয়া	তেঘরিয়া,
-পল্লি	বিধানপল্লি,
-বাজার	ইংলিশবাজার,

১২. নীচের বাক্যগুলির কর্তা খুঁজে বের করো :

১২.১ আমাদের দলটা এবার ছোটোপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে।

১২.২ পড়ন্তবেলায় আমরা অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম বাটাজোড় ছাড়ালাম।

১২.৩ সেটাও হাওয়ার দমকে উলটে গেল।

১২.৪ আমি হনহন করে পা চালালাম।

১২.৫ বেশ হই হই করে পথ চলছিলাম।

১৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৩.১ ছোটোপিসিমার বাড়ি যাওয়ার পথের বর্ণনা করো।

১৩.২ বড়োপিসিমার বাড়ি যাওয়ার পথে ঝড়-বৃষ্টি এবং কই মাছ ধরার বিবরণ দাও।

১৩.৩ বড়োপিসিমার বাড়ি থেকে ফেরার সময় প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ফাঁকা মাঠে কথকের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা লেখো।

১৩.৪ পাঠ্যাংশের নামকরণে 'অ্যাডভেঞ্চার' শব্দটির ব্যবহার কতটা যথাযথ হয়েছে, মতামত দাও।

১৩.৫ কোনো একটি বৃষ্টিমুখর দিনের কথা লেখো।

১৪. নীচের দুটি ছবির মধ্যে ছয়টি অমিল খুঁজে বের করো :

ছবি : দেবাশিস রায়

১৫. নীচের সূত্রগুলি কাজে লাগিয়ে শব্দছকটি পূরণ করো :

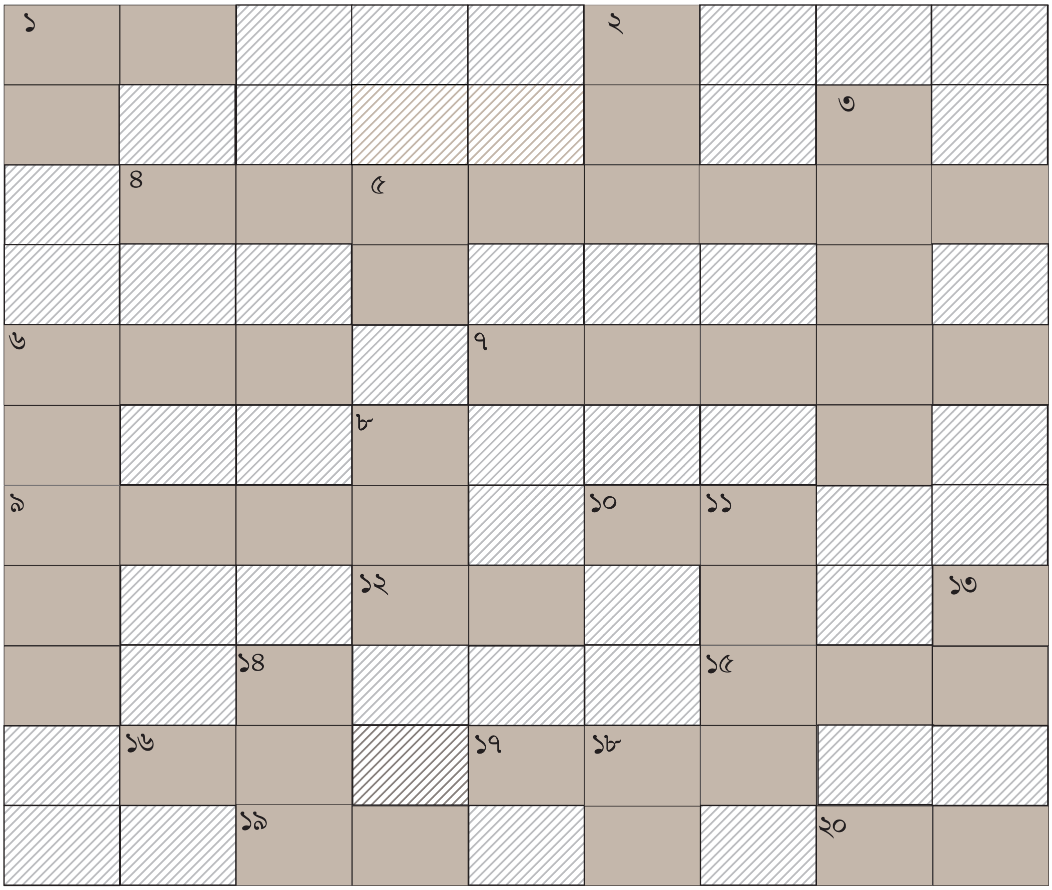

পাশাপাশি

(১) 'মাটির উঁচু পথের দুপাশে নানা উচ্চতার ______ ক্ষেত' (৪) বিখ্যাত সমাজ সংস্কারক (৬)' পাটক্ষেতের নীল হাওয়া এসে তাপ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে' (সমার্থক শব্দ লেখো) (৭) চাঁদসির ______ (৯) অশ্বিনীকুমার দত্তের গ্রাম (১০) 'আমাদের ______ জনের তাপ্পিমারা একটামাত্র ছাতা' (১২) 'তাড়াতাড়ি গা ______ মুছে পুরু কাঁথার মধ্যে সেঁধিয়ে গেলাম' (১৫)' সেটাও ______ -র দমকে উলটে গেল' (১৬) 'ঠিক হলো আমাদের ______ -টা এবার ছোটোপিসিমার বাড়ি হয়ে সেজোপিসিমার বাড়ি যাবে' (১৭) 'সে গাছ ______ বেঁধে আমাদের আগে আগে গাছে উঠে যায়' (১৯) 'দেড়-দুই কুড়ি ______ সেই উলটানো ছাতার মধ্যে ভরে ফেললাম' (২০) সেজোপিসিমার মেয়ের মাথা ছিল ______।

উপর-নীচ

(১) '______র মতো শিস দিতে পারি' (২) যাদের বাড়ি যাওয়া হয়েছিল সম্পর্কে তাঁরা কথকের ______ (৩) শেষে -পুর আছে এমন একটি জায়গার নাম (৫) 'অপরাহ্নে হঠাৎ মেঘ উঠল যেন ______ ঘাস দিয়ে বোনা পাখির বাসা' (৬) 'একটা ______ পর্যন্ত নেই' (৮) ' ______ ছোটোমা আমাকে ওই ঝড়জলের মধ্যে দেখে অবাক' (১১) সেজোপিসিমার গ্রামের নাম (১৩) 'জলের ______ কতদূর পর্যন্ত আমাদের ঘিরে আছে' (১৪) তার নাকে ______ (১৮) '______ ব্যাকুল হয়ে উঠেছে'।

সমাধান : পাশাপাশি— (১) পাট, (৪) অশ্বিনীকুমার দত্ত, (৬) গরম (৭) লোহার পুল (৯) বাটাজোড় (১০) পাঁচ (১২) মাথা (১৫) হাওয়া (১৬) দল (১৭) কোমর (১৯) কই (২০) ন্যাড়া

উপর-নীচ— (১) পাখি (২) পিসিমা (৩) বদরপুর (৫) নীল (৬) গরুবাছুর (৮) বড়োমা (১১) চন্দ্রহার (১৩) ছায়া (১৪) নোলক (১৮) মন।

১৬. মনে করো এই পাঠ্যাংশের অ্যাডভেঞ্চারের তুমি-ই মূল চরিত্র। পাঠ-অনুসরণে নীচের ছবিটির বিভিন্ন স্থানে নির্দিষ্ট খোপে স্বাধীন ও যথাযথ বাক্য লিখে একটি গল্পের চেহারা দাও :

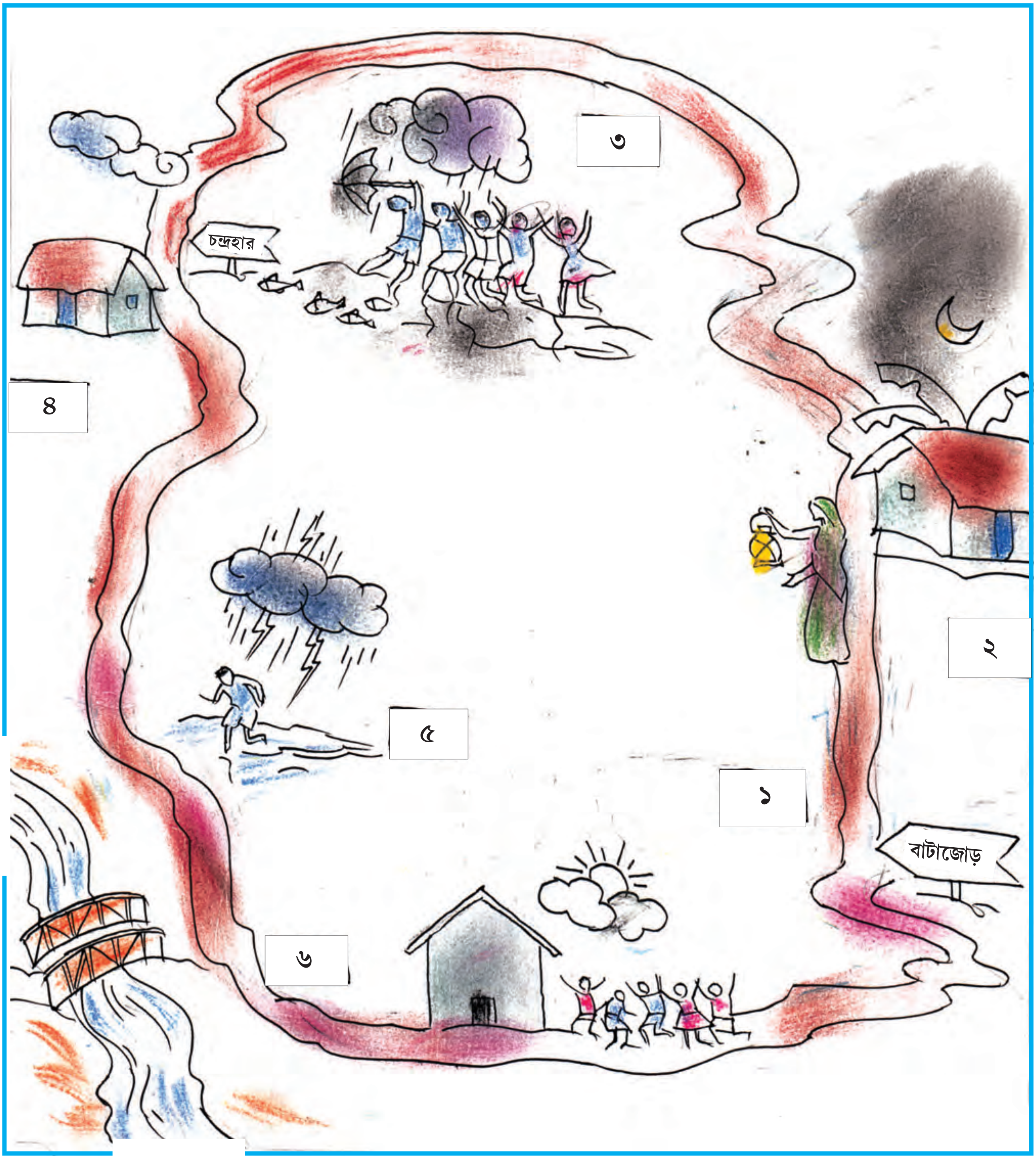

ছবির ধাঁধা

সুবিনয় রায়চৌধুরী

অংশহারা ছবি

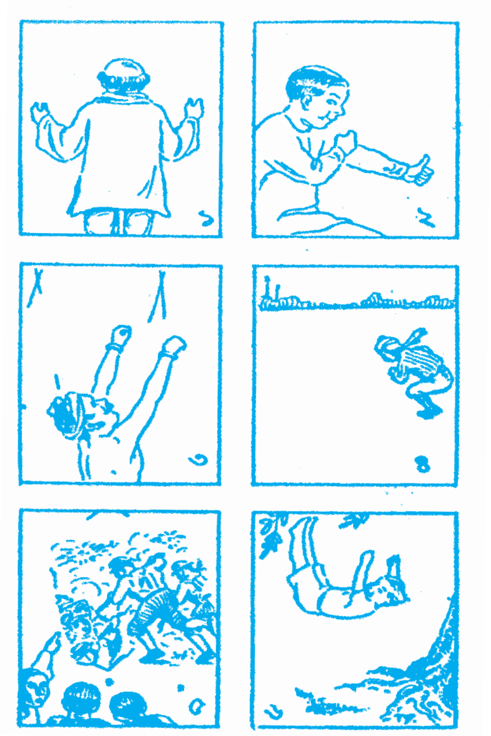

১। টা—খ—
২। ক—ম—
৩। কা—প—
৪। টে—ছু—
৫। র—জী—ছ—
৬। ম—সা—দু

পাশের ৬টি ছবি থেকে একটি করে জিনিস বা অংশ বাদ দেওয়া হয়েছে; ছবির নামের ও প্রত্যেক কথার প্রথম অক্ষরটি মাত্র দেওয়া হয়েছে। তোমরা বলতে পার কি, কোন ছবি থেকে কী বাদ পড়েছে আর কোন ছবির কী নাম?

কী করছে?

পাশে যে কয়টি ছবি দেওয়া হয়েছে তার প্রত্যেকটিতে একটি লোক কোনো একটি কাজ করছে (খেলা, বাজনা বাজানো বা অন্য কোনো কাজ) দেখানো হয়েছে। পাছে পোশাক দেখে বোঝা যায় কী কাজ করছে, তাই সব ছবিতেই একরকমের পোশাক দেওয়া হয়েছে। কোন ছবির লোকটি কী কাজ করছে তাই দেখানো হয়েছে, বলতে পারো কি?

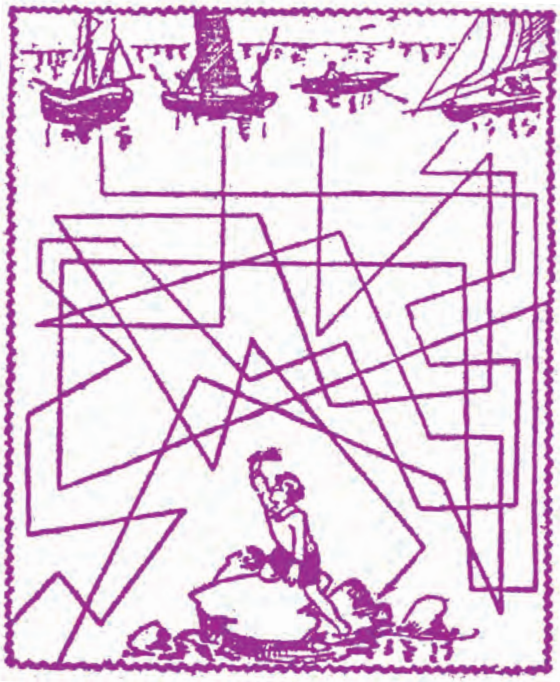

বিপদে ত্রাণ

ছেলেটি সমুদ্রে আটকা পড়েছে; নৌকাগুলি তাকে উদ্ধার করতে আসছে। আসবার রাস্তা আঁকাবাঁকা লাইন দিয়ে দেখানো হয়েছে। চারটি নৌকার কোনটি ছেলের কাছে পৌঁছোবে, বলত।

লুকোনো জন্তু

জঙ্গলে কত জন্তু লুকানো আছে দেখো? একটু খুঁজে দেখলেই পাবে।

লুকোনো বন্ধু

খরগোশ বলছে,---'বন্ধুরা গেল কোথা?' বামন বলছে, ---'সবাই লুকিয়ে আছে।' তাদের খুঁজে বের করো।

গোলক ধাঁধা

নীচের বাঁ দিকের কোণ থেকে মাঝখানে হাতির কাছে যাও। বেড়া ডিঙিয়ে যেতে পারবে না।

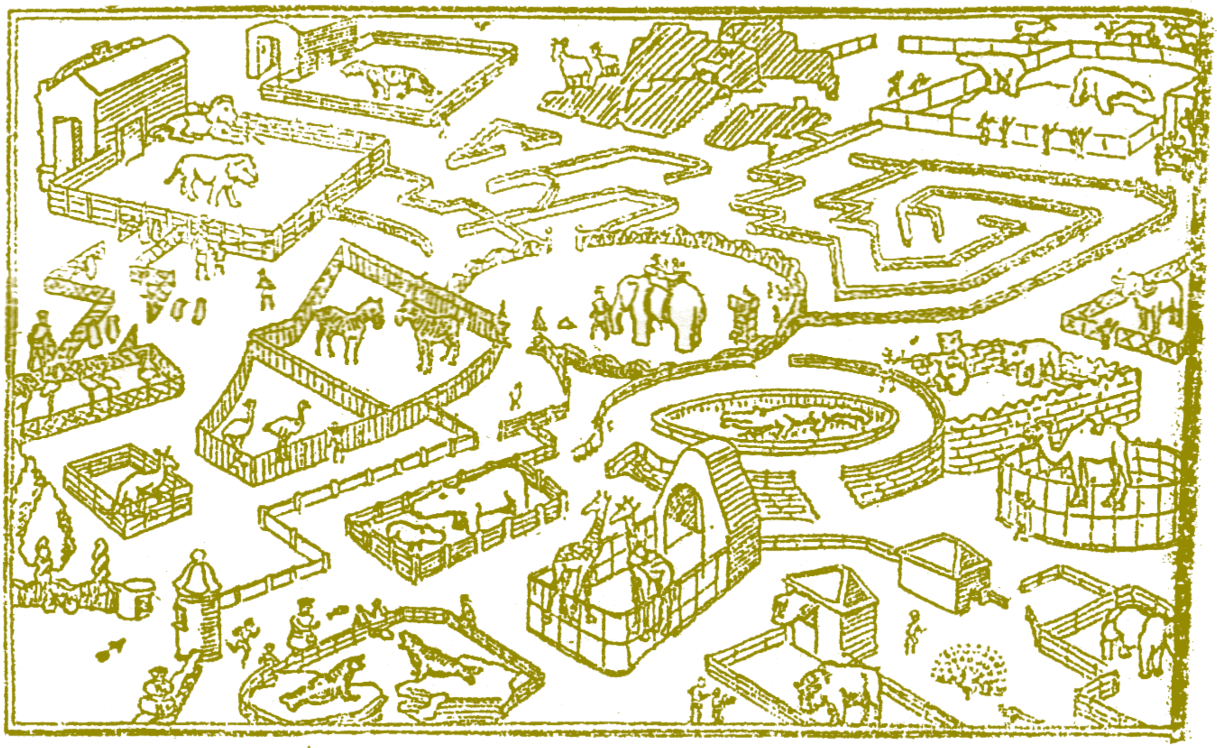

খাঁচার পথ !

নীচের বাঁ দিকের কোণ থেকে, আঁকাবাঁকা পথে, মাঝখানে পাখির খাঁচায় যেতে হবে। পথ খুঁজে বের করো।

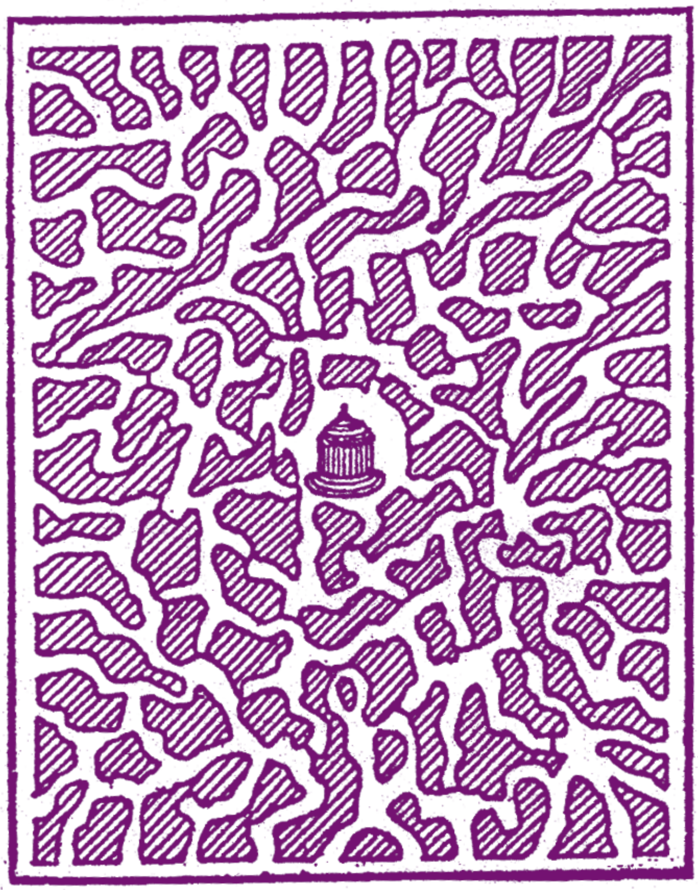

মৌমাছির পথ

মৌমাছি কোন পথে ফুলের কাছে যাবে বলতে পারো? বেড়া ডিঙিয়ে যাবার জো নেই।

উত্তর

অংশহারা ছবি :

১। টাটকা খবর

২। কলার মজা

৩। কাচার পরে

৪। টেনে ছুট

৫। রণের জীবন্ত ছবি

৬। 'মনের সাধে দুলি'

অংশ বাদ :

১। খবরের কাগজ

২। কলা

৩। দড়ি এবং কাপড়

৪। ঘোড়া

৫। ছবির ফ্রেম

৬। দোলনা

কী করছে?

১। ফুটবল খেলায় 'হেড' করছে, ২। ছিপ নিয়ে মাছ ধরছে, ৩। টেনিস খেলছে, ৪। খোলক, ঢোল জাতীয় বাদ্য বাজাচ্ছে, ৫। মোটর চালাচ্ছে, ৬। ঝাঁট দিচ্ছে, ৭। হা-ডু-ডু খেলছে, ৮। বেহালা বাজাচ্ছে, ৯। রিকশা টানছে।

বিপদে ত্রাণ !

ছোট্ট, পালহীন ডিঙি নৌকা ছেলের কাছে পৌঁছোবে।

খরবায়ু বয় বেগে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

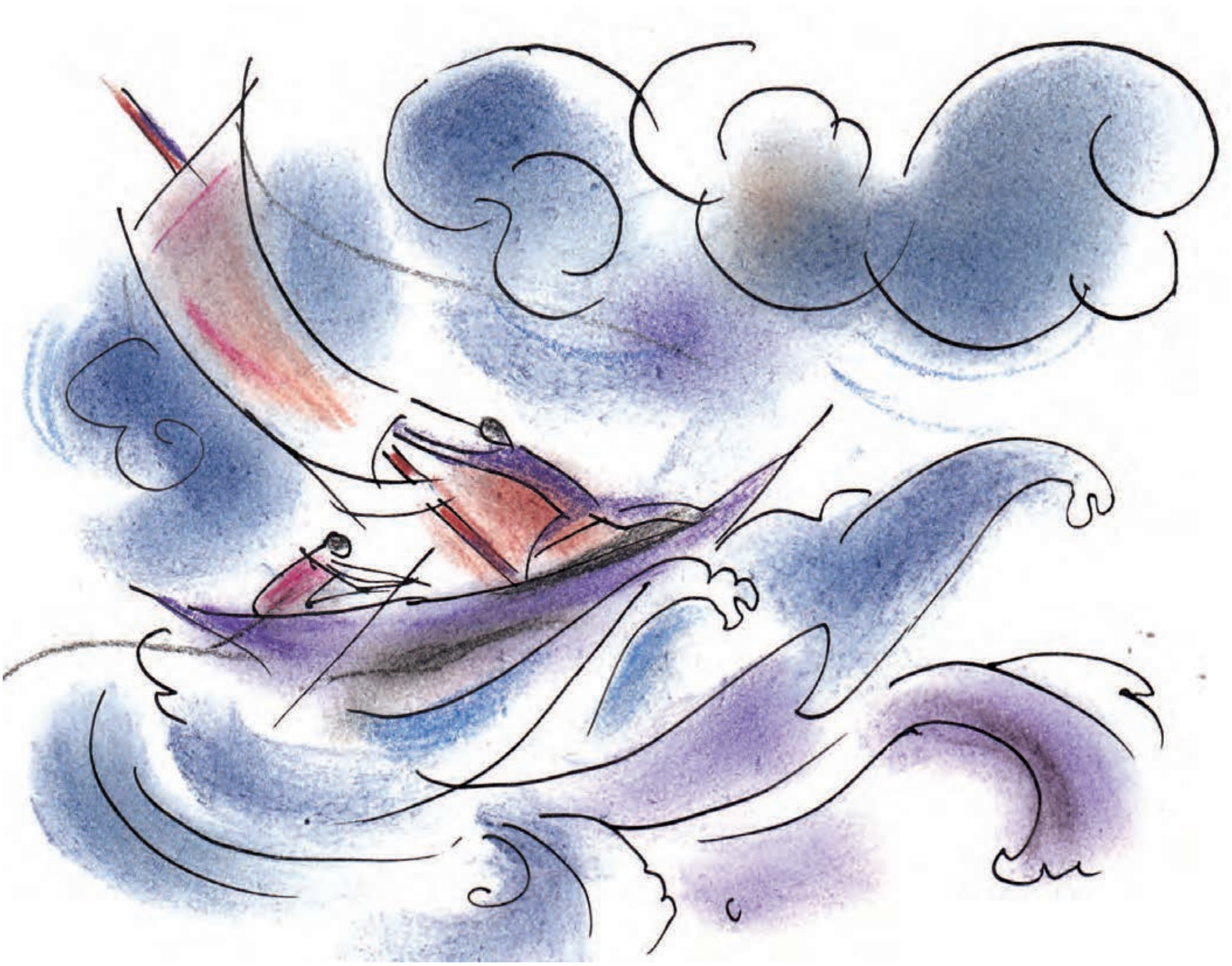

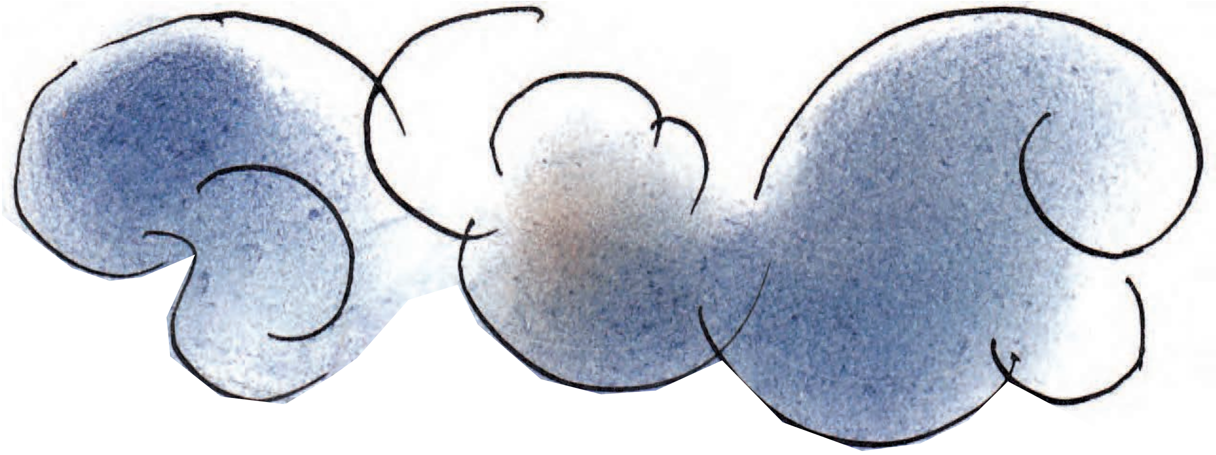

খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল—
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।
শৃঙ্খলে বারবার ঝনঝন ঝংকার নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার—
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর, টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো,মারো টান হাঁইয়ো।
গণি গণি দিন ক্ষণ চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কী না যাই রে'।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল, উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত,ঢেউ উঠে উত্তাল,
হয়ো নাকো কুণ্ঠিত, তালে তার দিয়ো তাল — জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো।

আমার মা-র বাপের বাড়ি

রাণী চন্দ

মা জলের দেশের মেয়ে, তবু জলের দোলা সইতে পারেন না। নৌকোতে উঠলেই তাঁর মাথা ঘোরে, বসে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দিদিরও তাই। মা আর দিদি নৌকোর ভিতরে বিছানা পেতে শুয়ে পড়েন। ছোটোভাইকে মা কোলের কাছেই শুইয়ে-বসিয়ে রাখেন। আমি দাদাদের সঙ্গে মামার সঙ্গে 'ছই'-এর বাইরে এসে বসে থাকি।

এক মাঝি পিছন দিকে হাল ধরে বসে থাকে, দুই মাঝি সামনের দিকে দু-পাশে বসে বৈঠা বায়।

বসে বসে দেখি।

সকাল পেরিয়ে যায়। ধলেশ্বরী নদীতে নৌকো এসে পড়ে।

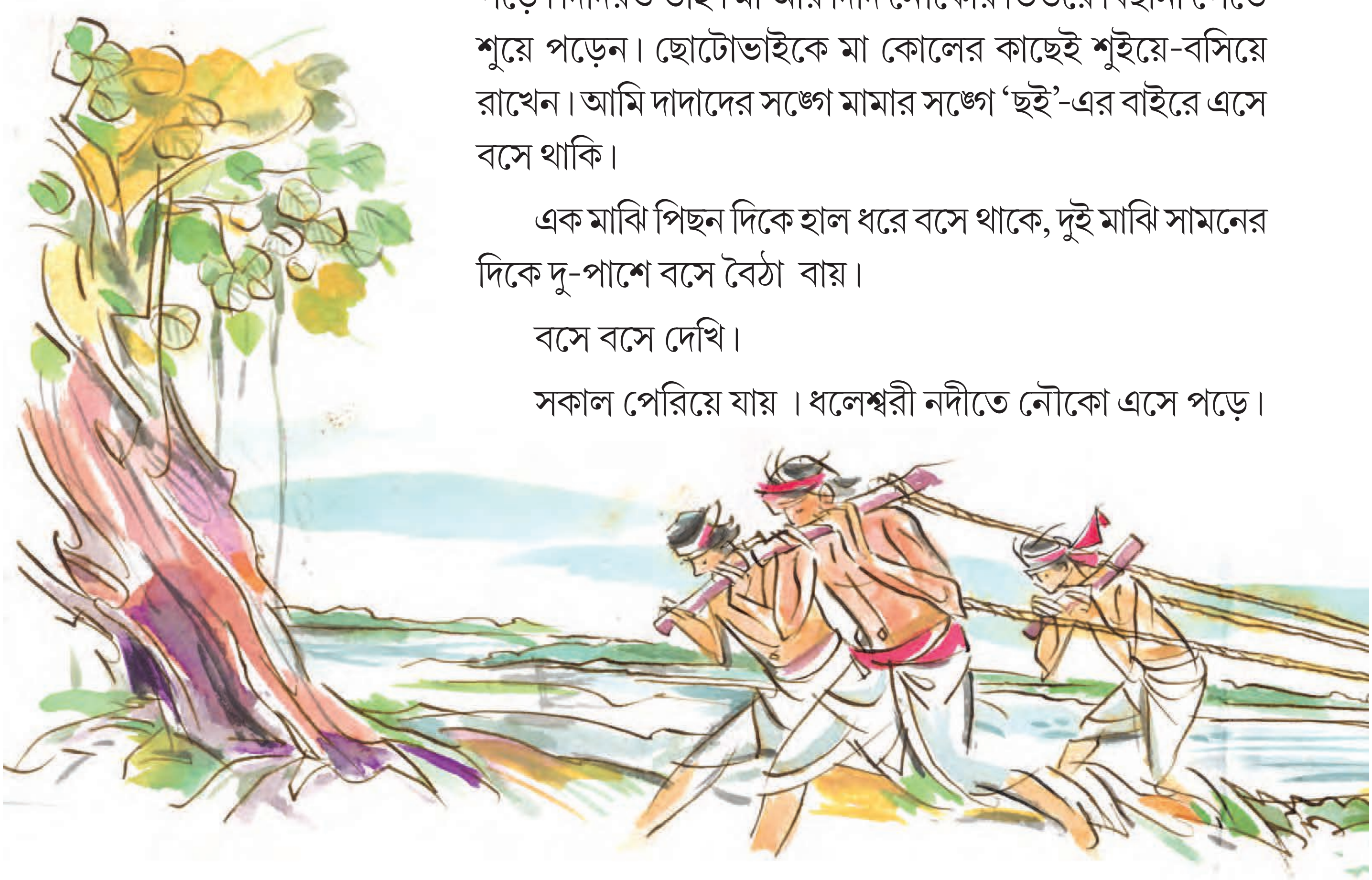

এই ধলেশ্বরী পাড়ি দেওয়াই এক বিষম আতঙ্কের ব্যাপার। মা চোখ বুজে শুয়ে থেকে থেকেই বলে ওঠেন– ‘ধলেশ্বরী আইলো নাকি ও—ও মাঝি ভাই?’

ধলেশ্বরী এসেছে শুনে মা চোখ দুটো টিপে বালিশের ভিতর মাথাটা আরও গুঁজে দেন।

মাঝিরাও ত্রস্ত হয়ে ওঠে। বড়ো মাঝি আকাশের দিকে তাকায়, হাওয়ার দিক লক্ষ করে , জলের গতির উপরে নজর রাখে, পরে তিন মাঝি স্বর মিলিয়ে ‘বদর বদর হৈ’ বলে নৌকোয় পাল তুলে দেয়।

ধলেশ্বরীর ঢেউ আছড়ে আছড়ে পড়ে নৌকোর গায়ে। ঘোলা জল—বিরাট নদীর একূল ওকূল দু-কূল ভরা জলে। ভেবে পাই না মাঝিরা নৌকো নিয়ে চলেছে কোন দিকে।

সবাই এক আতঙ্কে স্থির বসে। কথা নেই কারো মুখে। মাঝিরা শুধু থেকে থেকে হুংকার দিয়ে ওঠে—‘বলো ভাই—বদর বদর হৈ’।

ধলেশ্বরী খ্যাপা নদী। তালে বেতালে চলে। এলোপাতাড়ি ঢেউয়ের ধাক্কা কখনও এদিক হতে এসে লাগে, কখনও ওদিক হতে । চলার তাল ঠিক রাখতে জানে না ধলেশ্বরী। তাই হুঁশিয়ার থাকে মাল্লামাঝি যাত্রীভরা নৌকো নিয়ে।

ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে শান্তধারায় নৌকো আসে। মা উঠে বসেন। বলেন, ‘মাঝি ভাই রে—পাড়ে একটু লাগাও নৌকো, দুই পা একটু হাঁটি।’

নৌকো পাড়ে লাগে। টুপটাপ ভাইবোনেরা নৌকো থেকে লাফিয়ে পড়ি। পাড়ে নলখাগড়ার বন, বালির চর—ছুটোছুটি করি। গত রাত্রের রান্না করে আনা লুচি আলুরদম হালুয়া জলের ধারে বসে খাই। খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে আবার নৌকোয় উঠি।

এবার মাঝিরা নিশ্চিন্ত মনে জলে নৌকো ভাসায়। এক মাঝি নৌকোর পিছন দিকের পাটাতন তুলে নীচে রাখা মাটির উনুনে কাঠ জ্বালে। একটা মাটির মালসাতে করে নদীর জলে চাল ধোয়। পরে

চালে জলে মাটির হাঁড়ি ভরে জ্বলন্ত উনুনে বসিয়ে দেয়। লাল লাল মোটা মোটা চাল দেখতে দেখতে টগবগ করে ফুটতে আরম্ভ করে ।

ভাত হয়ে গেলে মাটির কড়াইতে মাছের ঝোল রাঁধে। বেশিরভাগ সময়ে ইলিশ মাছই থাকে। পথে আসতে আসতে এক সময়ে কিনে নিয়েছে জেলেডিঙা থেকে। নুন মাখানো মাছে একটু হলুদবাটা আর কাঁচালংকা ছেড়ে রান্না করা মাছের ঝোলের সুগন্ধ ভুরভুর করে। মাঝিরা একে একে মাটির থালায় ভাত বেড়ে খেয়ে নেয়। হাত বাড়িয়ে নদীর জলে থালা, বাটি, হাঁড়ি, কড়াই সব ধুয়ে আবার তুলে রাখে পাটাতনের নীচে।

ধীরে মন্থরে হেলে-দুলে নৌকো চলে। মাথার উপরে গাঙচিল উড়ে উড়ে চলে। শুশুক ওঠে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর—নিশ্বাস নিতে। একমনে দেখতে থাকি।

সূর্যের তাপে মাঝিদের গায়ের ঘাম শুকিয়ে কালো পিঠে ‘সাদা’ ফুটে ওঠে। মা বলেন—‘নুন ফুটে উঠেছে’। মাঝিরা নাকি নুন বেশি খায়—তাই এমনিভাবে নুন ফুটে ওঠে গায়ে।

মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, বেলার দিকে তাকিয়ে মাঝিদের তাড়া দেন—‘ মাঝি ভাই রে—অ মাঝি ভাই—বেলা থাকতে থাকতে পৌঁছাইয়া দিবা। তাড়াতাড়ি বাও’।

ইছামতী—যেন লক্ষ্মী মেয়েটি। অতি শান্ত তার চলার গতি। ইছামতীতে এলে পর তীরের দিকে নৌকো সরিয়ে এনে কম জল দেখে দুজন মাঝি হাঁটু-জলে লাফিয়ে পড়ে। হাতে তাদের মোটা দড়ি, মোটা কাঠি। তীরে উঠে এবারে তারা ‘গুণ’ টানতে থাকে। নৌকোয় বাঁধা লম্বা দড়ির আর এক মাথা মোটা কাঠির সঙ্গে বেঁধে কাঠিটা ঘাড়ে চেপে ধরে নদীর পাড় দিয়ে চলতে থাকে মাঝিরা। সে রশির টানে নৌকোও এগিয়ে চলে জলের উপরে তরতর করে।

চলতে চলতে বাঁদিকে উঁচু পাড়ে বটগাছের ছড়ানো শিকড় ধুয়ে যে খাল এসে পড়েছে ইছামতীর বুকে—সেই খালের মুখে নৌকো ঢোকে। মাঝিরা এবারে 'গুণ' 'বৈঠা' তুলে রেখে 'লগি' তুলে নেয় হাতে। খালের জলে লগি ঠেলে ঠেলে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলে।

খালের ধারে বাবন খাঁ দাদার বাড়ি। দাদামশায়ের বন্ধু ছিলেন বাবন খাঁ। বড়োভাইয়ের মতো দেখতেন ইনি দাদামশায়কে। মা ডাকতেন 'বাবনচাচা' বলে।

বাবনচাচার বড়ো ছেলে আলি হোসেন খাঁ। খালের জলে নৌকো আসতে দেখে হোসেনমামা হুঁকো টানতে টানতে এগিয়ে আসেন, বলেন, 'কার বাড়ির *নাইওরি* লইয়্যা যাও রে মাঝি?'

মা ছইয়ের বাইরে মুখ বের করে বলেন— 'আমি গো—হোসেনভাই।'

মাকে দেখে হোসেনমামা একমুখ হাসেন, বলেন— 'পুণি বইনদি যাও? তাই কও।'

মার নাম 'পূর্ণশশী', তাই ছোটো করে 'পুণি' বলেই ডাকেন মাকে বড়োরা।

হোসেনমামা ছুটে গিয়ে বাড়িতে ঢুকে এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকোতে তুলে দেন। হাঁকডাক করে গাছ থেকে দুটো কাঁঠালও পাড়িয়ে দেন। বলেন 'পোলাপান লইয়্যা খাইও তুমি বাড়িতে গিয়া।'

খালের বাঁকে বাঁকে জোলা, ভুঁইমালী, শেখমামাদের বাড়ি। নৌকো খালে ঢুকতে দেখেই তারা এগিয়ে আসে—কে আইলো?—না বোসের বাড়ির পুণি বইনদি আইলো।

মুখে মুখে বার্তা চলতে থাকে। মা বাপের বাড়িতে পা দেওয়ার আগেই দিদিমার কাছে খবর পৌঁছে যায়। 'টান' -এর দিনে বাড়ির ঘাট অবধি আসে না নৌকো। ডাঙা-পথে দিদিমারা এগিয়ে আসেন মুরলী ঘোষের বাঁশঝাড় অবধি। নৌকো যখন এসে থামে —ততক্ষণে দস্তুরমতো ভিড় সেখানে ।

গরমের ছুটিতে গ্রামে ঢুকি আমরা এই পথে। পুজোর ছুটিতে ঢুকি জল-ভরা বিলের উপর দিয়ে।

সেসময় তখনও বর্ষার জল সরে যায় না সব। ঢালু জমিতে থইথই জল। নন্দীদের বাঁধানো ঘাট থেকে ধু ধু বিল দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত। নৌকো এগিয়ে আসছে দেখতে পেয়েই হাঁকহাঁকি পড়ে যায় ঘাটে।— কার বাড়ির কুটুম আসছে — কার বাড়ির নাইওরি? পাড়ার লোক ছুটতে ছুটতে এসে জমে ঘাটে। গ্রামের মেয়ে বউ আসছে গ্রামে — এ আনন্দ যেন এদের সকলের। বধূরা বাদে গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা সকলে এসে ভিড় করে ঘাটে। দূর হতে দেখা যায় সেই ভিড়। মা ততক্ষণে ছইয়ের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন আর মাথা ঘোরানোর কথা মনে নেই তাঁর ।

বর্ষার জমা জল—অসুবিধা নেই কোনো, একেবারে বাড়ির ঘাটে এসে লাগে নৌকো। সঙ্গে সঙ্গে গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে আমাদের ঘিরে। ঘর পর সকলের সমান উল্লাস—যেন সবার ঘরেই কুটুম এল আজ। হই-চই উচ্ছ্বাস আনন্দে কেটে যায় বাকি বেলাটুকু ।

সন্ধেবেলার শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে। যে যার বাড়ি ফিরে যায়। আমরাও হাত মুখ ধুয়ে তুলসীতলায় প্রণাম করে ঘরে ঢুকি।

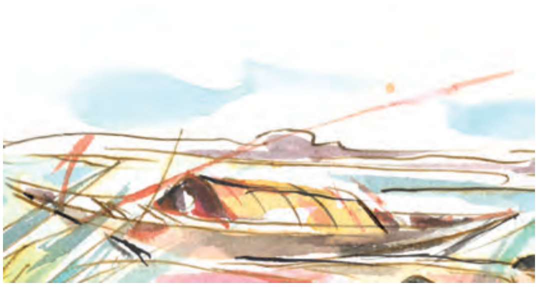

হাতেকলমে

রাণী চন্দ (১৯১২—১৯৯৭) : রাণী চন্দ অল্প বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেয়েছিলেন। রবীন্দ্র পরবর্তীযুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী এবং অন্যতম সাহিত্যিক। তিনি বিশ্বভারতীর কলেজ অফ ফাইন আর্টস-এ শিক্ষাগ্রহণ করেন। দেশের প্রথম মহিলা শিল্পী হিসাবে দিল্লি ও মুম্বাইতে একক চিত্র প্রদর্শনীর গৌরব অর্জন করেন। দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবন সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যের রাজভবনগুলিতেও তাঁর সুন্দর শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে। তাঁর রচিত বইগুলির মধ্যে — *জোড়াসাঁকোর ধারে, পূর্ণকুম্ভ, ঘরোয়া, সব হতে আপন, আমার মা-র বাপের বাড়ি* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। লেখিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের *ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক* এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক *ডক্টরেট* উপাধি পেয়েছিলেন।

১. রাণী চন্দের লেখা দুটি বইয়ের নাম লেখো।

২. তিনি কী কী সাম্মানিক উপাধি পেয়েছিলেন?

৩. শব্দঝুড়ি থেকে ঠিক শব্দ বেছে নিয়ে উপযুক্ত স্থানে বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

শব্দঝুড়ি
থই থই, তরতর, ধু ধু, টগবগ

৩.১ লাল লাল মোটা মোটা চাল দেখতে দেখতে ______ করে ফুটতে আরম্ভ করে।

৩.২ ঢালু জমিতে ______ জল।

৩.৩ নন্দীদের বাঁধানো ঘাট থেকে ______ বিল দেখা যায় বহুদূর পর্যন্ত।

৩.৪ নৌকোও এগিয়ে চলে ______ করে।

৪. ডানদিক ও বামদিকের স্তম্ভদুটি মেলাও :

ক	খ
বসে বসে	পৌঁছাইয়া দিবা।
হোসেনমামা হুঁকো টানতে টানতে	নৌকা চলে।
গাঙচিল উড়ে উড়ে	এসে ঘাটে জমে।
ধলেশ্বরীর ঢেউ আছড়ে আছড়ে	এগিয়ে আসেন।
খালের জলে লগি ঠেলে ঠেলে	দেখি।
বেলা থাকতে থাকতে	পড়ে নৌকার গায়ে।
পাড়ার লোক ছুটতে ছুটতে	চলে।

৫. নীচের বাক্যগুলিতে কোন বচনের ব্যবহার হয়েছে লেখো :

৫.১ মা জলের দেশের মেয়ে।

৫.২ তিন মাঝি স্বর মিলিয়ে 'বদর বদর হৈ' বলে নৌকায় পাল তুলে দেয়।

৫.৩ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা এসে ভিড় করে ঘাটে।

৫.৪ যে যার বাড়ি ফিরে যায়।

৫.৫ বাবনচাচার বড়ো ছেলে আলি হোসেন খাঁ।

৫.৬ সন্ধেবেলার শাঁখ বেজে ওঠে ঘরে ঘরে।

৫.৭ গোটা গ্রাম ভেঙে পড়ে আমাদের ঘিরে।

৫.৮ শুশুক ওঠে ক্ষণে ক্ষণে জলের উপর।

৫.৯ ধলেশ্বরী খ্যাপা নদী।

৫.১০ মাঝিরা নাকি নুন বেশি খায়।

৬. 'আমার মা' বা 'বাপের বাড়ি' শব্দবন্ধদুটি দুটি করে শব্দ 'আমি' ও 'মা' এবং 'বাপ' ও 'বাড়ি'-র যোগে তৈরি। খেয়াল করে দেখো প্রতিক্ষেত্রেই শব্দদুটি যুক্ত হয়েছে '-র' বা '-এর' ব্যবহার করে। অর্থাৎ, (আমি+র=আমার) এবং (বাপ+এর=বাপের)। এইভাবে '-র' বা '-এর' যোগ করে দুটি আলাদা শব্দের মধ্যে সম্বন্ধ তৈরি করা যায় বলে এমন পদগুলিকে বলা হয় 'সম্বন্ধ পদ'। '-র' বা '-এর' যোগ করে সম্বন্ধ পদ তৈরি হয়েছে এমন কয়েকটি উদাহরণ পাঠ্যাংশটি থেকে খুঁজে বের করো। তোমাদের সুবিধের জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া থাকল। উদাহরণ : জলের দেশ।

৭. 'আমার মা-র বাপের বাড়ি'- শব্দবন্ধনীটিতে তিনবার, 'জলের দেশের মেয়ে' শব্দবন্ধনীতে দুবার '-র' বা '-এর' ব্যবহার করে একটিমাত্র সম্বন্ধ পদ গড়ে তোলা হয়েছে। তোমরা এইরকম আরও পাঁচটি সম্বন্ধ পদ লেখো যেখানে অন্তত দুবার '-র' বা '-এর' ব্যবহার হয়েছে। এরপর নতুন তৈরি শব্দগুলি একটি করে স্বাধীন বাক্যে ব্যবহার করো।

উদাহরণ : গোপালের মাসির হাতের রান্না খেলে আর ভোলা যায় না।

৮. নির্দেশ অনুযায়ী পুরুষ পরিবর্তন করো :

৮.১ মাটির কড়াইতে মাছের ঝোল রাঁধে। (উত্তম পুরুষ)

৮.২ ভেবে পাই না মাঝিরা নৌকা নিয়ে চলেছে কোন দিকে। (প্রথম পুরুষ)

৮.৩ বসে বসে দেখি। (মধ্যম পুরুষ)

৮.৪ যে যার বাড়ি ফিরে যায়। (উত্তম পুরুষ)

৮.৫ পোলাপান লইয়্যা খাইও তুমি বাড়িতে গিয়া। (উত্তম পুরুষ)

৮.৬ পুণি বইনদি যাও ? (প্রথম পুরুষ)

৮.৭ এখন আর মাথা ঘোরার কথা মনে নেই তাঁর। (মধ্যম পুরুষ)

৮.৮ অতি শান্ত তোমার চলার গতি। (মধ্যম পুরুষ)

৮.৯ দুই পা একটু হাঁটি। (প্রথম পুরুষ)

৮.১০ 'বদর বদর হৈ' বলে নৌকোয় পাল তুলে দেয়। (উত্তম পুরুষ)

৯. নীচের শব্দগুলির বিপরীত লিঙ্গের শব্দ পাঠ্যাংশটি থেকে খুঁজে বের করো :

দাদি, মামি, ছোটোবোন, দিদিমা, বড়োছেলে, দিদি, বালিকা, বর, বৃদ্ধা, বান্ধবী, লক্ষ্মী ছেলে, চাচি।

শব্দার্থ : ছই — নৌকার ছাউনি। বায় — বেয়ে নিয়ে যাওয়া। বদর — পাঁচ পিরের অন্যতম বদরগাছি। জলযাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন হয় সেইজন্য মাঝিরা এঁর নাম স্মরণ করেন। খ্যাপা — পাগল। তালে-বেতালে — ছন্দ সমেত ও ছন্দহীন হয়ে। গুণ টানা—দড়ি দিয়ে বেঁধে নৌকা টানা। পোলাপান — ছেলেমেয়ে। দস্তুরমতো — রীতিমতো। আবালবৃদ্ধবনিতা — বালকবৃদ্ধ নারী সকলেই। কুটুম — আত্মীয়। নাইওরি — পূর্ববঙ্গের কোনো বধূর নদীপথে বাপের বাড়ি যাত্রা।

১০. নীচের বাক্যগুলির কর্ম খুঁজে বের করো :

১০.১ মাঝিরা একে একে মাটির থালায় ভাত বেড়ে খেয়ে নেয়।

১০.২ হোসেনমামা এক কাঁদি পাকা কলা এনে নৌকাতে তুলে দেন।

১০.৩ এক মাঝি মাটির উনুনে কাঠ জ্বালে।

১০.৪ মাঝিরা নিশ্চিন্ত মনে নৌকা ভাসায়।

১০.৫ মা জলের দোলা সইতে পারেন না।

১১. রচনাংশ থেকে ঠিক ক্রিয়াপদ বেছে নিয়ে নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো :

১১.১ মাঝিরা জলের গতির উপরে _____ ।

১১.২ ধলেশ্বরী নদী _____ ।

১১.৩ হই-চই উচ্ছ্বাস আনন্দে বাকি বেলাটুকু _____ ।

১১.৪ মুখে মুখে বার্তা _____ ।

১১.৫ মা আর দিদি নৌকোর ভিতরে _____ ।

১১.৬ 'রাম' নাম _____ ।

১১.৭ বেশির ভাগ সময়ে ইলিশ মাছই _____ ।

১১.৮ মা 'বাবনচাচা' _____ ।

১১.৯ কার বাড়ির 'নাইওরি' _____ রে মাঝি?

১১.১০ তখনও বর্ষার সব জল _____ ।

১২. অনধিক দু-তিনটি বাক্যে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও:

১২.১ পাঠ্যাংশে কাকে জলের দেশের মেয়ে বলা হয়েছে?

১২.২ ‘ছই’ বলতে কী বোঝো?

১২.৩ কাদের সঙ্গে ছই-এর বাইরে বসে থাকতে দেখা যায়?

১২.৪ কাদের ‘বদর বদর হৈ’ বলে চিৎকার করতে দেখা যায়?

১২.৫ কোন নদীকে ‘খ্যাপা নদী’ বলা হয়েছে?

১২.৬ বালির চরের প্রসঙ্গ পাঠ্যাংশে কীভাবে এসেছে?

১২.৭ নৌকোয় কী কী রান্না হয়েছিল?

১২.৮ নদীতে যেতে যেতে কোন কোন প্রাণীর দেখা মিলেছে?

১২.৯ ‘গুণ টানা’ বলতে কী বোঝো?

১২.১০ মাঝিরা কখন হাতে ‘লগি’ তুলে নেয়?

১২.১১ ‘নাইওরি’ কথাটির অর্থ কী?

১২.১২ হোসেনমামা কী কী উপহার এনেছিলেন?

১২.১৩ খালের বাঁকে বাঁকে কাদের কাদের বাড়ি চোখে পড়ে?

১২.১৪ গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটিতে মামাবাড়িতে আসার পথ বদলে যায় কেন?

১৩. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের ভাষায় লেখো :

১৩.১ লেখিকার মা-র বাপের বাড়ি লেখিকার কী? সেখানে যাওয়ার যাত্রাপথটি বর্ণনা করো।

১৩.২ পাঠটির অনুসরণে ‘ধলেশ্বরী’ নদীর পরিচয় দাও।

১৩.৩ নৌকোয় রান্নাবান্না ও খাওয়াদাওয়ার বিশদ বিবরণ দাও।

১৩.৪ পাঠ্যাংশ অনুসরণে ‘ইছামতী’ নদী সম্বন্ধে পাঁচটি বাক্য লেখো।

১৩.৫ লেখিকার দাদামশায়ের পরিবারের সঙ্গে বাবন খাঁ-দের পরিবারের সম্পর্ক কেমন ছিল? বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে তোমার মতামতের সপক্ষে যুক্তি দাও।

১৩.৬ লেখিকার মাকে কেন জলের দেশের মেয়ে বলা হয়েছে?

১৩.৭ পাঠ্যাংশে বাংলার পল্লিজীবনের বিভিন্ন ধরনের মানুষের মিলেমিশে একসঙ্গে থাকার যে ছবি ফুটে উঠেছে তা নানা ঘটনা উল্লেখ করে লেখো।

১৩.৮ তোমার নৌ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করো। যারা নৌকা চড়োনি তারা একটি কাল্পনিক নৌ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লেখো।

১৩.৯ তোমার দেখা দুটি নদী এবং সেখানে ও তার আশেপাশে থাকা বিভিন্ন প্রাণী আর উদ্ভিদ নিয়ে দুটি পৃথক অনুচ্ছেদ রচনা করো।

১৪. এই পাঠ থেকে তোমরা জেনেছ নৌকা চালানোর সময় কখনও বৈঠা বাওয়া হয়, কখনও গুণ টানা হয়, কখনও বা ঠেলা হয় লগি দিয়ে। নীচের ছবিটিতে বিভিন্ন যানবাহন এবং তাদের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের ছবি এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। যন্ত্রগুলিকে তাদের নিজস্ব বাহনের সঙ্গে যোগ করো :

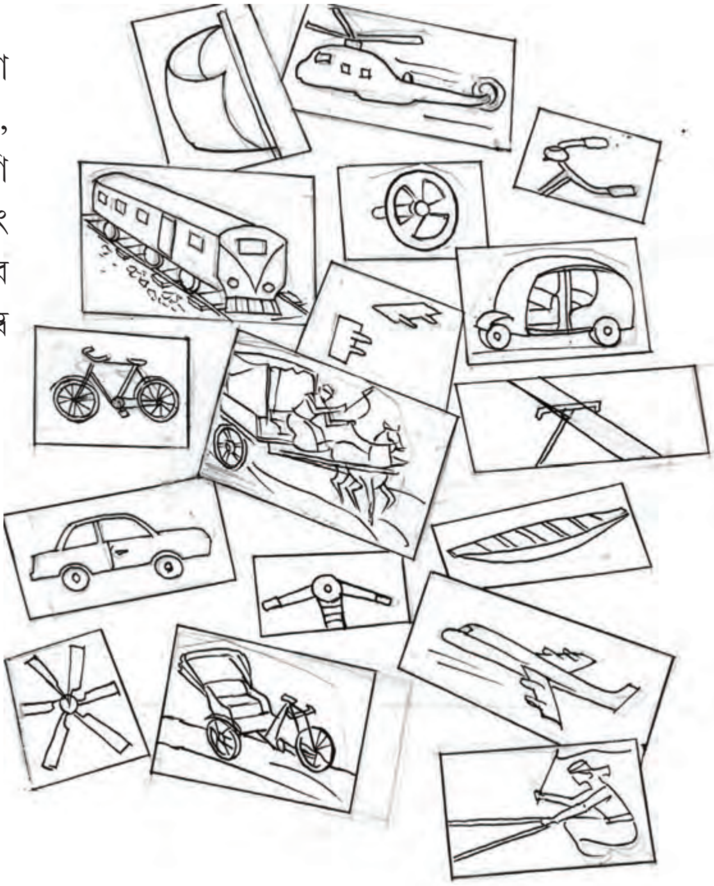

১৫. নীচের নৌকোগুলির মধ্যে যে নৌকোটি তোমার পছন্দ নিজের খাতায় তার ছবি আঁকো।

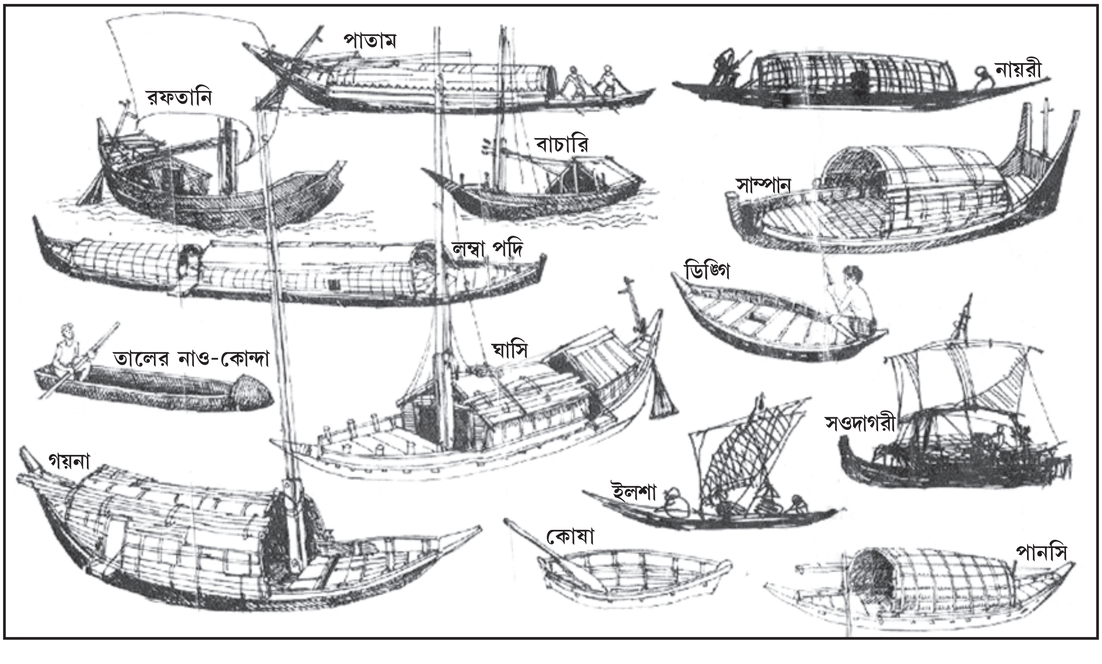

১৬. নীচের খেলাটি লুডোর মতো ছক্কা চেলে খেলতে হবে। একা কিংবা অনেকজন মিলে খেলাটি খেলা যেতে পারে। ছক্কার দান অনুযায়ী ঘুঁটি এগোবে, বিভিন্ন ঘরে লেখা নির্দেশ অনুসারে ঘুঁটি এগোবে অথবা পিছোবে। যে সবার আগে ১০০-সংখ্যক ঘরে পৌঁছোবে, সে জিতবে।

মা-র বাপের বাড়ি ১০০	৯৯	৯৮	৯৭	ঘাট অবধি জল তিনঘর এগোও ৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১
৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	মুখেমুখে খবর দুইঘর এগোও ৮৭	৮৮	৮৯	৯০
৮০	৭৯	৭৮	হোসেনমামার উপহার দশঘর এগোও ৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৭১
৬১	লগি ঠেলা চারঘর পিছোও ৬২	৬৩	৬৪	৬৫	লগি ঠেলা দুইঘর পিছোও ৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০
৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৫৪	গুণ টানা তিনঘর পিছোও ৫৩	৫২	৫১
৪১	৪২	ইছামতী পাঁচঘর এগোও ৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০
৪০	৩৯	৩৮	৩৭	৩৬	চরে বনভোজন পাঁচঘর এগোও ৩৫	৩৪	৩৩	৩২	৩১
২১	২২	ধলেশ্বরীর ঘূর্ণি পাঁচঘর পিছোও ২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০
২০	১৯	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	ধলেশ্বরীর ঘূর্ণি দশঘর পিছোও ১৩	১২	১১
১ আরম্ভ	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০

১৭. বড্ডো বেশি ‘ব’

নীচের ছবিটি থেকে অন্তত তিরিশটি বস্তু/ বিষয় খুঁজে বের করো যাদের নাম ‘ব’ দিয়ে শুরু :

মিলিয়ে পড়ো	আমার মায়ের বাপের বাড়িতে তোমরা পড়লে নদীতে নৌকো যাত্রার গল্প। সেরকমই আরেকটি ভ্রমণের কথা রইল এখানে।

নদীপথে

অতুল গুপ্ত

গৌহাটি থেকে রওনা হতে বেলা বাজল এগারোটা। বেলা দুটোরও পর পর্যন্ত ডাইনে পাহাড়ের সার চলছে নদীর প্রায় পাড় ঘেঁষে। নিবিড় বনে ঢাকা পাহাড়; হঠাৎ মাঝে মাঝে এক-একটা পাহাড়ের খানিকটা অনাবৃত কালো পাথরে মোড়া, প্রকাণ্ড ঐরাবতের পাশের মতো। এক সার পাহাড়ের পিছনে আর-এক সার, তারপর আবার এক সার, দূরে দূরে আরও-সব সারের মাথা দেখা যাচ্ছে, অতি পাতলা নীল ওড়নার মতো ফিকে নীল কুয়াশায় ঢাকা। এক জায়গায় একটা পাহাড় তার সঙ্গীদের ছেড়ে আড়াআড়ি সোজা চলে এসেছে জলের মধ্যে, নদীর সঙ্গে পরিচয় নিবিড় করতে। উলটো দিকের পাড় একটা চরের জিহ্বা অনেক দূর নদীর মধ্যে এগিয়ে দিয়েছে। এ জায়গাটা স্টিমার পার হলো অতি ধীরে ও সাবধানে।

বাঁ দিকের পাহাড় সব দূরে দূরে। তৃণলেশহীন উঁচু চর চলেছে মাইলের পর মাইল—ব্রহ্মপুত্রের তরঙ্গলাঞ্ছনা পাশে আঁকা। অনুজ্জ্বল রৌদ্রে মনে হচ্ছে যেন চুনারি পাথরে তৈরি। আজও আকাশে মেঘ আছে, তবে রোদকে ঢাকতে পারেনি, শুধু নিষ্প্রভ করেছে।

ডান দিকের পাহাড়ের প্রাচীরটা যখন একটু একঘেয়ে বোধ হচ্ছে এমন সময় হঠাৎ পাহাড় গেল দূরে সরে। পূর্ব বাংলার শীতের নদীর পরিচিত রূপটি ফুটে উঠল। এখানে ওখানে ছড়ানো চরের শুভ্র বালু কেটে কালো নীল জলের ধারা, দিকচক্রবালে গাছের ঘন সবুজ রেখা।

বেলা পড়ে আসছে; কেবিনের সামনে বেতের কুরসিতে রোদে বসে আছি। সম্মুখে একটা গোল চর, চারদিকে নীল পাহাড়; যারা ছিল নদীর পাশে, বাঁক ঘুরে মনে হচ্ছে তারা যেন নদীর মাঝ থেকে উঠেছে। একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যকে আড়াল করেছে—রুপালি জরির পাড় দেওয়া নীলাম্বরীর আঁচল; মাঝখানে একটা চোখ-ঝলসানো গোল ফুটো দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে; নদীতে রঙের স্রোত। সব মিলে মনে হচ্ছে যেন *টার্নারের* একখানা ছবি।

একটা চরের ওপারে নদীর মধ্যে সূর্য অস্ত গেল; আগুনের প্রকাণ্ড গ্লোব। ঘড়িতে পাঁচটা ছ-মিনিট। অনেকটা পুবে চলে এসেছি। শুক্রবার দিন সূর্যাস্তের সময় ঘড়িতে ছিল পাঁচটা পনেরো মিনিট। তবে আমার এ হাতঘড়িকে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তি করা চলে না। ওর তিন দিনের গতিবিধির ফল অনেক সময় চমকপ্রদ।

স্তব্ধ ব্রহ্মপুত্রের বুকের উপর সন্ধ্যা নেমে এল। পুবে প্রতিপদের সোনালি চাঁদ, পশ্চিম-আকাশে বৃহস্পতি জ্বলজ্বল করছে।

জোসেফ ম্যালর্ড উইলিয়ম টার্নার (১৭৭৫ — ১৮৫১) : পৃথিবী বিখ্যাত ব্রিটিশ চিত্রশিল্পী। জলরং ও তেলরঙে নিসর্গচিত্র আঁকার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর আঁকা ইংল্যান্ডের নদী ও সমুদ্রের ছবির সঙ্গে লেখক পূর্ববঙ্গে নদীবক্ষে ভ্রমণকালে দেখা নিসর্গদৃশ্যের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন।

দূরের পাল্লা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

ছিপ্‌খান্ তিন্-দাঁড়—
তিনজন্ মাল্লা
চৌপর দিন-ভোর
দ্যায় দূর-পাল্লা।

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল, — জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পান্নার টাঁকশাল।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগ্‌ছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শ্যাওলায় ঢাক্‌ছে।

চুপ চুপ— ওই ডুব
দ্যায় পান্‌কৌটি,
দ্যায় ডুব টুপ টুপ
ঘোম্‌টার বউটি।

ঝক্‌ঝক্ কলসির
বক্‌বক্ শোন্ গো,
ঘোম্‌টায় ফাঁক রয়
মন উন্মন্ গো।

তিন দাঁড় ছিপ্‌খান্
মন্থর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে ?

(অংশ)

হাতে কলমে

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২—১৯২২) : জন্মস্থান বর্ধমান জেলার চুপি গ্রাম। পিতা রজনীনাথ দত্ত এবং মাতামহ বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ অক্ষয়কুমার দত্ত। রবীন্দ্র সমকালীন কবিদের মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় কবি। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলো — *সবিতা, সন্ধিক্ষণ, বেণু ও বীণা, ফুলের ফসল, কুহু ও কেকা, বেলাশেষের গান, বিদায় আরতি* প্রভৃতি এবং অনুবাদ কবিতা — *তীর্থসলিল, তীর্থরেণু, মণিমঞ্জুষা* প্রভৃতি। বাংলা সাহিত্যের জগতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ *ছন্দের জাদুকর* নামে পরিচিত। *নবকুমার কবিরত্ন* ছদ্মনামে তিনি বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনা করেছেন। পাঠ্য কবিতাটি তাঁর *বিদায় আরতি* নামক কবিতার বই থেকে নেওয়া।

১. কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্যজগতে কোন অভিধায় অভিহিত?

২. তাঁর লেখা দুটি কবিতার বইয়ের নাম লেখো।

৩. **নীচের প্রশ্নগুলির একটি বাক্যে উত্তর দাও :**

৩.১ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কী নামে পরিচিত?

৩.২ কবিতাংশে যে নৌকোটির কথা রয়েছে, তাতে কতজন মাঝি রয়েছেন?

৩.৩ বন-হাঁস কী করছে?

৩.৪ নদীজলে কাদের ডুব দিতে দেখা যাচ্ছে?

৩.৫ মাঝিরা কেমনভাবে নৌকো বেয়ে চলেছে?

৪. ‘চৌপর’ শব্দের অর্থ সমস্ত দিন বা রাত। কবিতাংশে দিনের নানা ছবি কীভাবে পড়েছে তা লেখো।

৫. ‘পাল্লা’ শব্দটিকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি স্বাধীন বাক্য রচনা করো।

৬. ‘দাঁড়’ শব্দটি কবিতায় কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? শব্দটিকে পৃথক অর্থে ব্যবহার করে একটি বাক্য রচনা করো।

৭. ‘দিন-ভোর’ শব্দবন্ধের অর্থ সমস্ত দিন। সারাদিনের কাজ বোঝাতে তুমি আর কোন শব্দ ব্যবহার করতে পারো?

৮. ‘ঝোপঝাড়’ - এর মতো সমার্থক/প্রায় সমার্থক শব্দ পাশাপাশি বসিয়ে পাঁচটি নতুন শব্দ তৈরি করো।

৯. ‘পান্না’ ও ‘চর’ শব্দদুটিকে দুটি পৃথক অর্থে ব্যবহার করে দুটি স্বাধীন বাক্য রচনা করো।

১০. ‘টুপ্‌টুপ্’ ‘ঝক্‌ঝক্’ , ‘বক্‌বক্’ এর মতো ধ্বন্যাত্মক / অনুকার শব্দদ্বৈতের পাঁচটি উদাহরণ দাও।